وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'রাগ করো না'। ব্যক্তিটি বারংবার উপদেশ চাইলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেকবার বললেন, রাগ করো না' (বুখারী, ৬১১৬; মিশকাত, ৫১০৪)।

● ৬ষ্ঠ বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● ডিসেম্বর ২০২১

Web : www.al-itisam.com

সূচিপত্র

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٧، ربيع الثاني و جمادى الأولى ١٤٤٣هـ/ ديسمبر ٢٠٢١م العدد: ٢، الجزء: ٢٢
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

জামে আছর হোসাইন বলখিয়া মসজিদ (১৯৮৮-১৯৯৪ ইং) : ব্রুনাইয়ের রাজধানী বন্দরসেরী বেগাবানের কিয়ারং-এ ২০ একর জমির উপর দেশের অন্যতম জাতীয় মসজিদটি বর্তমান সুলতান নির্মাণ করেন। ৫ হাজার মুছল্লী ধারণক্ষমতার মসজিদটিতে নয়নাভিরাম ২৯টি সোনালী গম্বুজ এবং ১৯০ফুট উচ্চতার ৪টি মিনার রয়েছে। নিশীথে মসজিদটি যেন হেমবরণ কিরণ ছড়ায়।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৩ ‖ ঈসায়ী ২০২১ ‖ বঙ্গীয় ১৪২৮

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ ডিসেম্বর	২৫ রাবী:আখের	বুধ	০৫:০৪	০৬:২৪	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
০৫ ,,	২৯ ,,	শুক্র	০৫:০৭	০৬:২৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
১০ ,,	০৫ জুমা উলা	মঙ্গল	০৫:১০	০৬:৩০	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
১৫ ,,	১০ ,,	সোম	০৫:১৩	০৬:৩৩	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৫
২০ ,,	১৫ ,,	শনি	০৫:১৫	০৬:৩৬	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৭	০৬:৩৭
২৫ ,,	২০ ,,	বৃহস্পতি	০৫:১৮	০৬:৩৮	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৩৯

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+১	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	০	০	-৩
টাঙ্গাইল	+৩	+৩	+১
ফরিদপুর	-২	-২	-৪
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	-২	-১	-৪
মাদারীপুর	০	-১	+২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১
শরিয়তপুর	-১	-২	-১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+২	+১	-২
শেরপুর	+৪	+৩	০
জামালপুর	+৪	+৪	০
নেত্রকোনা	+১	+১	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৮	-৩
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৭	-৯	-৪
রাঙ্গামাটি	-৮	-১০	-৪
বান্দরবান	-৯	-১০	-৪
কুমিল্লা	-৩	-৪	-২
নোয়াখালী	-৪	-৫	-১
লক্ষীপুর	+৪	+৪	+২
চাঁদপুর	+৩	+৩	+১
ফেনী	-৫	-৬	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৪	-৪	-৮
সুনামগঞ্জ	-২	-২	-৬
মৌলভীবাজার	-৪	-৪	-৬
হবিগঞ্জ	-৩	-৩	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৮	+৮	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৮
নাটোর	+৭	+৬	+৩
পাবনা	+৫	+৫	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৪	+২
বগুড়া	+৬	+৬	+৩
নওগাঁ	+৮	+৭	+৪
জয়পুরহাট	+৮	+৮	+৩

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৭	+৮	+১
দিনাজপুর	+৩	+১০	+৪
গাইবান্ধা	+৬	+৬	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৬	০
লালমনিরহাট	+৭	+৭	০
নীলফামারী	+৯	+১০	+৩
পঞ্চগড়	+১১	+১১	+৪
ঠাকুরগাঁও	+১১	+১১	+৪

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৩	+২	+৫
বাগেরহাট	+১	০	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৩	+৭
যশোর	-১	-২	-২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৫	+৪	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	০	-১	+২
মাগুরা	+৪	+৩	+৫
নড়াইল	+৩	+২	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-২	+২
পটুয়াখালী	-১	-২	+৩
পিরোজপুর	+১	-১	-৪
ঝালকাঠি	০	-১	-৩
ভোলা	-২	-৩	+১
বরগুনা	-১	-২	+৪

৬ষ্ঠ বর্ষ
২য় সংখ্যা
ডিসেম্বর-২০২১
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৮
রবীঃ আখের-জুমাঃ উলা
১৪৪৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (বিকাল ৪:০০মি.-৫:৩০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে : বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০২

প্রবন্ধ

» হজ্জ ও উমরা (পর্ব-১৬) ০৩
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

» লোক দেখানো আমলের পরিণতি (পর্ব-৪) ০৫
-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

» আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব (শেষ পর্ব) ০৮
-মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

» একটি লিফলেটের ইলমী জবাব (পর্ব-৫) ১০
-আহমাদুল্লাহ

» তাসবীহ পাঠের পদ্ধতি ১২
-সাঈদুর রহমান

» মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ১৫
-মো. আরিফুর রহমান

» মূর্খদের সাথে বিতর্ক : শরীআত কী বলে? ১৮
-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন

» দাড়ি সম্পর্কে ইসলামের বিধান ২১
-সাজ্জাদ সালাদীন

» থার্টিফার্স্ট নাইট : বর্ষবরণের নামে অশ্লীলতা ২৩
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন

হারামাইনের মিম্বার থেকে

» জীবনের মূল্য ২৭
-অনুবাদ : মো. তরিকুল ইসলাম

তরুণ প্রতিভা

» মুমিনের কর্ম ও গুণাবলি ৩০
-নাজমুল হাসান সাকিব

সাময়িক প্রসঙ্গ

» বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে জলবায়ু সম্মেলনের কি আদৌ কোনো ভূমিকা আছে? ৩১
-জুয়েল রানা

দিশারী

» হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় করো এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক হও ৩৩
-জাবির হোসেন

শিক্ষার্থীদের পাতা

» মনীষী পরিচিতি-১ : আল্লামা নাযীর আহমাদ রহমানী আযমগড়ী ৩৫
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

» বিয়ে নিয়ে ভাবনা ৩৭
ওমর ফারুক বিন মুসলিমুদ্দীন

কবিতা ৩৯

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪০

সওয়াল-জওয়াব ৪২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

‘সুন্নী’ খপ্পর থেকে সাবধান!

প্রাচীনকাল থেকে বহু ফেরকার উর্বরভূমি ভারত উপমহাদেশ। এখানে কত যে দল-মত-ফেরকার জন্ম হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান বের করা মুশকিল। কথিত ‘সুন্নী’ জামাআত সেসবের অন্যতম। আহমাদ রেযা খান ওরফে ‘আ‘লা হযরত’ (১৮৫৬-১৯২১ খ্রি./১২৭২-১৩৪০ হি.)-এর হাত ধরে ভারতের উত্তর প্রদেশের ‘ব্রেলী’তে ব্রিটিশ আমলে এ ফেরকার জন্ম হয়। মূলত ভারত-পাকিস্তানেই এদের সংখ্যাধিক্য। অবশ্য বাংলাদেশেও এদের অনুসারীর সংখ্যা কম নয়। ইউরোপীয় দেশসমূহেও তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মরিশাসসহ আফ্রিকার কিছু কিছু দেশে তাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। জনগণের চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদেরকে তাদের সামনে খাঁটি মুসলিম হিসেবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে সর্বজন গৃহীত দু’টি পবিত্র নাম ‘সুন্নী’ ও ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত’ নাম দু’টি তারা ব্যবহার করে। ব্রেলভী নামে তারা সমধিক পরিচিত। রেজভী, আশেকে রাসূল ﷺ নামেও তারা পরিচিত। এদের বর্তমান নেতা আন-নাওয়ারীর নামানুসারে এদেরকে জামাআতে নাওয়ারীও বলা হয়। বিশালাকার সবুজ পাগড়ি এদের প্রতীক। নানা রঙের ঝলমলে নকশাদার পোশাক পরতে দেখা যায় তাদের ধর্মগুরুদের। বর্তমানে পাকিস্তান হচ্ছে তাদের মূল কেন্দ্র। ভারতের মুম্বাইয়ের ‘রেযা একাডেমী’ তাদের প্রধান কেন্দ্র। লন্ডনে তাদের ‘বৃটিশ মুসলিম ফোরাম’ ও ‘ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন’ নামে দু’টি সংগঠন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘ইমাম আহমাদ রেযা একাডেমী’ নামক একটি দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া ‘দাওয়াতে ইসলামী’ এবং ‘সুন্নী দাওয়াতে ইসলামী’ নামক দু’টি আন্তর্জাতিক দাওয়াতী মিশন তারা পরিচালনা করে। এদের অনেকগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করা সত্ত্বেও চূড়ান্তভাবে যারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে, তাদের মধ্যে এই সুন্নী ফেরকা অন্যতম। শীআ ও ছূফীদের সাথে এদের বেজায় মিল রয়েছে; বরং তারা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মীলাদ, ক্বিয়াম, ওরস, জশনে জুলূস, মাযারপূজা, কবরপূজা, পীরপূজা, শিরক, কুফরের মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটানো ও জিইয়ে রাখার মূল কারিগর এরাই। বাংলাদেশের খানকা, মাযারগুলো মূলত এদেরই মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায় চলে। যেখানে রাসূল ﷺ নিজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন, তাঁকে কেবল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলার আদেশ করেছেন *(বুখারী, হা/৩৪৪৫)*, সেখানে ব্রেলভীরা তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ির খেলায় মেতেছে। রাসূল ﷺ, তার পরিবার-পরিজন ও ওলি-আওলিয়ার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনই তাদের মূলমন্ত্র। এরা একদিকে রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে চরম বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহর সমান মর্যাদা দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখায়। অপরদিকে রাসূলপ্রেমিক সেজে তাঁর সম্মানে মুখরোচক কুফরী স্লোগান ও গীতি-কবিতা গেয়ে সুন্নাতকে জবাই করে। রাসূল ﷺ শুধু নন, বরং তাঁর সাথে ওলী-আওলিয়াও দুনিয়া পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত রয়েছে বলে তারা মনে করে। তাদের মতে, রাসূল ﷺ হাযির-নাযির, গায়েবজান্তা। ফলে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয। তারা ঈদে মীলাদুন্নবীকে সবচেয়ে বড় ঈদ মনে করে এবং মহাধুমধামে জশনে জুলূসের আয়োজন করে। তারাই ওলী-আওলিয়ার মাযারে কথিত ‘ওরস শরীফ’ পালন করে, যেখানে নানা স্টাইলে হরেক রকমের যিকিরের সমারোহ দেখা যায়। এমনকি বাদ্যযন্ত্র, নাচ-গানও সেখানে চলে হরদম, নারী-পুরুষেরর ফ্রি মিক্সিং তো রয়েছেই। কাফের ফতওয়া দেওয়া তাদের নিকট ডালভাত। এরকম কত যে শিরকী, কুফরী ও বিদআতী আক্বীদা-আমলের সাথে তারা জড়িত, তার হিসাব দেওয়া মুশকিল।

অনলাইন-অফলাইন, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট বিভিন্ন মিডিয়ায় তারা তাদের ছূফীবাদী ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচারের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থাপনা ভরে ফেলেছে নানা স্লোগান সম্বলিত লাল দেওয়াল লেখনি দিয়ে। শীত মৌসুমে তারা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খানকা-মাযারে ‘ওরস শরীফ’, ‘সুন্নী সমাবেশ’সহ বিভিন্ন সমাবেশের আয়োজন করে এবং রাসূলপ্রেমের নামে শিরক, বিদআত ও কুফর ছড়ায়।

এই বিভ্রান্ত দল ও এদের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে নিজেদের হেফাযতে রাখা এবং সাধারণ জনগণকে এদের খপ্পর থেকে রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব। অতএব, সাবধান! বাহ্যিক লেবাস ও মুখরোচক স্লোগানে কেউ প্রতারিত হবেন না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমরণ বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের উপর ক্বায়েম ও দায়েম রাখুন- আমীন!

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-১৬)

যা বর্জনীয় :

(১) যমযমের পানি দিয়ে গোসল করা।

(২) যমযমের পানি দিয়ে শরীরের কোনো অংশ ধুয়ে ফেলা।

(৩) বরকতের নিয়্যতে যমযমের পানি দিয়ে কাপড় ধৌত করা।

(৪) যমযমের পানি অপচয় করা।

ছাফা-মারওয়া সাঈ করা : যমযমের পানি পান করার পর ছাফা-মারওয়া সাত চক্কর সাঈ করতে হবে। তামাত্তু হজ্জের সময় এটা উমরার সাঈ হবে। ক্বেরান ও ইফরাদ হজ্জের ক্ষেত্রে এ সময় সাঈ করলে ১০ তারিখে করতে হবে না। তবে এ সময় না করে ১০ তারিখে করা যায়। অবশ্য ত্বাওয়াফের সাথেই করা উত্তম। কারণ, নবী করীম ﷺ হজ্জে ক্বেরান করেছিলেন। ঐ সময় তিনি ত্বাওয়াফের সাথে সাঈ করেছিলেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ 'রাসূল ﷺ কালো পাথর থেকে কালো পাথর পর্যন্ত তিন বার রামাল (দ্রুত হাটা) করলেন। আর চার বার স্বাভাবিক চললেন। আর যখন তিনি ছাফা-মারওয়া সাঈ করছিলেন, তখন তিনি 'বাত্বনে মাসীল' হতে দৌড়ে যাচ্ছিলেন'।[১] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ ত্বাওয়াফের সাথে সাঈ করেছিলেন।

হায়েয অবস্থায় মহিলারা সাঈ করতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে রাসূল ﷺ বলেন, فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ 'হাজীগণ যেভাবে হজ্জ পালন করেন তুমি সেভাবে সব বিধান পালন করো। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ত্বাওয়াফ করো না'।[২] এই হাদীছে প্রমাণিত হয়, মহিলারা হায়েয অবস্থায় সাঈ করতে পারে। সাঈ হজ্জ বা উমরার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ। এটা ভিন্ন কোনো ইবাদত নয়। অতএব, হজ্জ-উমরা ছাড়া সাঈ করা যাবে না। সাঈ শুরু হবে ছাফা হতে। উপরে উঠে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلاَهُ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ (মদীনা থেকে) এসে মক্কায় প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেটিকে চুমা দিলেন। তারপর বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করলেন। অতঃপর ছাফা পাহাড়ে আসলেন এবং তার উপর এমনভাবে চড়লেন যাতে তিনি কা'বাঘর দেখতে পাচ্ছিলেন। তারপর তিনি দুই হাত তুললেন এবং ইচ্ছামতো আল্লাহর যিকির করতে থাকলেন ও দু'আ করলেন।[৩]

ছাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে প্রথমে পাঠ করবে,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

'নিশ্চয় ছাফা-মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়ে শুরু করছি'।[৪] এরপর বলবে, اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (তিন বার)। তারপর (তিন বার) বলবে, لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ অর্থ : 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই। সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। আমরা ফিরে যাই, তওবা করি তাঁর নিকটে। আমরা ইবাদত ও প্রশংসা করি আমাদের রবের। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেনে। তিনি একাই সম্মিলিত শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন'।[৫]

উক্ত দু'আটি এক বার বলার পর নিজের জন্য দু'আ করবে। এভাবে তিন বার দু'আ করবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ যখন ছাফা পাহাড়ে দাঁড়াতেন,

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১২৬১; মিশকাত, হা/২৫৬৫।
২. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৪; নাসাঈ, হা/২৯০।
৩. আবূ দাঊদ, হা/১৮৭২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৯৬১, হাদীছ ছহীহ।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫।
৫. আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ ওয়াল উমরা, পৃ. ২৫।

তখন তিন বার اللهُ أَكْبَرُ বলতেন। তারপর বলতেন, لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অর্থ : 'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান'। এভাবে তিন বার বলতেন। তারপর দু'আ করতেন। এভাবে মারওয়া পাহাড়ের উপরও দু'আ করতেন।[৬]

সুলায়মান ইবনু মুগীরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজারে আসওয়াদের পাশে আসলেন, তাতে চুমু দিলেন। তারপর বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করলেন। অতঃপর যখন ত্বাওয়াফ শেষ করলেন, তখন ছাফা পাহাড়ে আসলেন এবং পাহাড়ের উপরে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে তাকালেন। অতঃপর দুই হাত উঠালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর ইচ্ছামতো দু'আ করতে লাগলেন।[৭] জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজারে আসওয়াদের নিকট আসলেন এবং তাতে চুমু দিলেন। তারপর দরজা দিয়ে ছাফা পাহাড়ের দিকে বের হয়ে গেলেন। তারপর যখন তিনি ছাফার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি তেলাওয়াত করলেন, ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ 'নিশ্চয় ছাফা এবং মারওয়া পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত'। তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি সেই পাহাড় থেকে সাঈ আরম্ভ করছি যে পাহাড় থেকে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন। অতঃপর তিনি ছাফা হতে আরম্ভ করলেন এবং ছাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন। এমনকি তিনি কা'বাঘর দেখতে পেলেন এবং কেবলামুখী হলেন এবং আল্লাহ এক বলে ঘোষণা দিলেন। অতঃপর তাকবীর পাঠ করলেন এবং বললেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

তারপর কিছু সময় দু'আ করলেন। অনুরূপ তিন বার করলেন। অতঃপর ছাফা থেকে নামলেন এবং মারওয়ার দিকে হেঁটে চললেন। এমনকি তার দুই পা সমতল যমীনে পৌঁছে গেল। অতঃপর তিনি দৌঁড়ে চললেন, এমনকি সমতল যমীন পার হয়ে গেলেন। আবার যখন উচুঁতে উঠতে লাগলেন, তখন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন। শেষে মারওয়ায় পৌঁছে গেলেন এবং মারওয়ায় সেভাবেই দু'আ করলেন, যেভাবে ছাফার উপর করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মারওয়ায় এসে ত্বাওয়াফ শেষ হলো।[৮]

উক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা বুঝা গেল, ছাফা হতে মারওয়ার দিকে যেতে হবে এবং বর্তমান সবুজ বাতির স্থানে দৌঁড়াবে। তবে মহিলারা দৌঁড়াবে না। মারওয়ার উপরে কা'বামুখী হয়ে হাত তুলে ছাফার মতোই তাকবীর ও দু'আ পাঠ করবে। তবে আয়াতটি শুধু ছাফায় পড়বে। ছাফা হতে মারওয়ায় পৌঁছলে এক চক্কর হয়। আবার মারওয়া হতে ছাফায় আসলে দুই চক্কর হয়। এভাবে মারওয়ায় সাত চক্কর শেষ হবে। ছাফা এবং মারওয়ায় যতবার উঠবে একই নিয়মে প্রতিবার তাকবীর বলবে এবং হাত তুলে দু'আ করবে। ছাফা-মারওয়াতে সাঈর সময় নির্ধারিত কোনো দু'আ নেই। নিজের ইচ্ছামতো কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ হতে প্রমাণিত দু'আ, তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির করবে। কিছু না জানা থাকলে নিজের ভাষায় আল্লাহকে ডাকবে। তবে ছাহাবীগণ হতে নিম্নের দু'আটি প্রমাণিত। আবূ ইসহাক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি ইবনু উমারকে ছাফা-মারওয়ার মাঝে বলতে শুনেছি, رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَوْ أَنَّكَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর দয়া করো। নিশ্চয় তুমি মহাসম্মানিত, মহান দানশীল'।[৯]

সাঈ করা অবস্থায় যা নিষিদ্ধ :

(১) সাঈ করা অবস্থায় পুরুষদের ডান কাঁধ খোলা রাখা।

(২) প্রতি চক্করে বিশেষ দু'আ পড়া।

(৩) সাঈ চলা অবস্থায় ছালাত শুরু হলে একাকী ছালাত আরম্ভ করা এবং জামাআতে শরীক না হওয়া।

(৪) সাঈ শেষে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা।

(৫) ছাফা-মারওয়ায় পাথর ছোঁয়া এবং মুখে ও গায়ে মাখা।

(৬) নারীরা পুরুষদের সাথে সবুজ চিহ্নিত স্থানে দৌঁড়ানো।

(চলবে)

৬. সুনাদে আহমাদ, হা/১৫২১০; নাসাঈ, হা/২৯৭২, হাদীছ ছহীহ।
৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৮০।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫।
৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৯১৩৫ ।

www.al-itisam.com

লোক দেখানো আমলের পরিণতি

-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*

(অক্টোবর'২১ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৪)

যারা লোক দেখানোর জন্য বা মানুষকে শুনানোর জন্য আমল করবে, তাদেরকে পরিশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ এরূপ কাজকে ইসলামে শিরক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কর্মে আল্লাহর সন্তুষ্টি মূল উদ্দেশ্য থাকে না। আর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত না হলে তিনি তা কবুল করবেন না। প্রতিটি ইবাদতের মূল লক্ষ্যই হবে প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আবূ উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন, ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যে ছওয়াব ও সুনামের জন্য জিহাদ করে? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। সে ব্যক্তি তা তিন বার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, তার জন্য কিছুই নেই। তারপর তিনি বললেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোনো আমল কবুল করবেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ হৃদয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য না করা হয়'।[১] বিধায় লৌকিকতা প্রদর্শনী বা সুনাম অর্জনের জন্য নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্যই সকল ইবাদত করা উচিত। সর্বাগ্রে হৃদয়কে শিরকী আক্বীদা হতে মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

সুধি পাঠক! রিয়া এবং সুমআ তথা মানুষকে দেখানো কিংবা সুনাম অর্জনের জন্য আমল করার বিষয়টি খুবই ভয়াবহ। যার শেষ পরিণাম জাহান্নাম। অথচ মানুষ এ অপরাধটি করতে কোনো দ্বিধাই করে না। বহু মুসলিম কেবল প্রদর্শনীর জন্যই ইবাদত করে থাকে। এক শ্রেণির মানুষকে সারা বছর ইবাদতের ধারেকাছেও দেখা যায় না। অথচ নির্বাচনের প্রাক্কালে টুপি, বাহারি পাঞ্জাবি ও পায়জামায় নিজেকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে তুলে ধরে। তাদের সালামের ধরনও পরিবর্তন হয়ে যায়। আবার এক শ্রেণির আলেম নিজেকে তাক্বওয়াবান হিসেবে অনেক বড় করে যাহির করে। নিজের পরহেযগারিতা ও সততার বিবরণ তুল ধরতে পঞ্চমুখর হয়। অথচ তার মধ্যে তাক্বওয়ার লেশমাত্র নেই। স্রেফ লৌকিকতা তার মূল উদ্দেশ্য। তার কথা-কর্মের মধ্যে থাকে বিস্তর ব্যবধান। তার বায়ান শুনে মনে হবে যেন এ কেবলই আকাশ থেকে নেমে এসেছে। কিন্তু তার ব্যক্তিজীবন পরখ করলে দেখা যাবে সম্পূর্ণই উল্টো চিত্র। যেন বয়ানগুলো ছিল কেবল মানুষের জন্য; তার নিজের জন্য নয়।

আর কুরবানী কেন্দ্রীক রিয়া ও সুমআ তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। এলাকার মধ্যে সেরা কুরবানীটি কেনার জন্য চলে রমরমা প্রতিযোগিত। কেউ দাম শুনতে না চাইলে ছলেবলে কৌশলে তাকে পশুটির দাম শুনাতেই হবে। আর গোশত কতটুকু হয়েছে সেটি অন্যকে না শুনালে যেন কুরবানীই বৃথা। কারো সাথে আলাপচারিতায় প্রথমেই থাকে নিজের ক্রয়কৃত কুরবানীর প্রশংসনীয় বিবরণ। কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। কিন্তু তাদের এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য হলো নিজের সুনাম ও খ্যাতি সর্বমহলে ছড়িয়ে দেওয়া। অথচ এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ 'আল্লাহর কাছে পৌঁছে না ওগুলোর (কুরবানী কৃত পশুর) গোশত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া' *(আল-হজ্জ, ২২/৩৭)*।

কতক দানশীলকে দেখা যায়, সে দানের প্রতিযোগিতায় লেগেছে। নিজেকে বড় দানবীর হিসেবে প্রকাশ করাই যেন মূল লক্ষ্য। তার দানের পূর্ণ বিবরণের ঘোষণা দিতে ত্রুটি হলে ঘোষককে একহাত দেখিয়ে ছেড়ে দেন। দুই ঈদে এবং বিভিন্ন দুর্যোগকালীন ত্রাণ বিতরণে এদের দেখা মিলে বেশি। তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কথায় কথায় নিজের দানের বিষয় তুলে ধরে। যা দান করে তার প্রচারকে বেশি করে ভালোবাসে। আবার অনেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সভা-সমাবেশে নিজেকে যাহির করার জন্য পদ চেয়ে নেয়। এরূপ ব্যক্তিরা পোস্টার, লিফলেট কিংবা বিজ্ঞাপনে নিজের নাম, পদবি বা ডিগ্রি প্রচার করতে ব্যস্ত থাকে। নাম, পদবি বা ডিগ্রির বিবরণ লিখতে একটু উলট-পালট হয়ে গেলে উক্ত সমাবেশে না আসার হুংকার ছাড়ে। কখনোবা কর্তৃপক্ষকে দ্বিতীয়বার বিজ্ঞাপন ছাপাতে বাধ্য করে।

আবার এক শ্রেণির মুসলিম নিজেকে ফেমাস করার জন্য ব্যতিব্যস্ত। ছোট থেকে ছোট প্রতিটি বিষয়ই ফেসবুক, টুইটার, ম্যাসেঞ্জারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতেই মশগূল থাকে। অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় বিষয় সকলকে জানাতেও ভুলে না। কেননা সেগুলোতে তার খ্যাতি

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. নাসাঈ, হা/৩১৪০; আল-মুসনাদুল জামে', হা/৫৩৩৪; ছহীহ আত-তারগীব, হা/১৩৩১; সিলসিলা ছহীহা, হা/৫২, সনদ ছহীহ।

জড়িত থাকে। এরূপ সেলফিপ্রেমিক ব্যক্তিরা স্বীয় মৃত আপনজনের লাশের সাথে সেলফি তুলে প্রচার করতে ছাড়ে না। হজ্জ ও উমরা করতে গিয়ে কা'বাঘরকে ঘিরেও চলে তাদের বাহারি সেলফির আমেজ। জামরায় পাথর মারার সময় সেলফি তোলা বাদ পড়ে না। এক শয়তান তাড়ানোর সুন্নাত জাগ্রত করতে গিয়ে আরেক শয়তানকে মনের মধ্যে জায়গা করে দেয়। এরা সেলফি তোলার জন্য মেকি ছালাতের ভঙ্গিও ধারণ করে। কেউ কেউ কুরবানীর পশুর সাথেও সেলফি তুলতে দ্বিধাবোধ করে না। অনেকে ফেমাস হতে গিয়ে ভয়ংকর দৃশ্যের সাথেও সেলফিতে নিজেক বন্দি করতে চায়। ফলে এই সেলফির বিষাক্ত ছোবলে অনেকের জীবনের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ঘটে। সেলফি বর্তমানে এক প্রকার নেশায় রূপ নিয়েছে।

প্রিয় পাঠক! উল্লিখিত বিষয়গুলো একটু গভীর মনে ভাবলে দেখা যায় বর্তমান সমাজের চিত্র কতটা করুণ। রিয়া বা সুমআ তথা লৌকিকতার কবল থেকে বেঁচে আছে খুব কমসংখ্যক ব্যক্তি। আলেম, ওলামা, হাজী, গাজী, মোল্লা, মুনশী, সাধারণ শিক্ষিত, মাস্টার, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার কেউ রিয়া-সুমআ থেকে নিরাপদ নয়। সকলেই এ বিষয়ে বিপাকে রয়েছে। তবে যাদের আল্লাহ হেফাযত করেছেন তাদের কথা ভিন্ন। যারা খালেছ অন্তরে সঠিক পন্থায় সৎ আমল সম্পাদন করে তারা নিরাপদ। তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর বিশেষ রহমত।

শিরকের ভয়াবহ পরিণাম :

শিরক এক ভয়ংকর ও জঘন্য অপরাধ। যার শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। জীবনের যাবতীয় কৃত সৎআমলকে ধ্বংস করে দেয়। যখন কোনো ব্যক্তি শিরক করে বসে তখনই তার সব আমল বরবাদ হয়ে যায়। কোনো আমল অবশিষ্ট থাকে না। ফলে ঐ লোকটি চরম ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেন, ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ 'তারা যদি শিরক করে, তাহলে তারা যা আমল করেছে সবই বাতিল হয়ে যাবে' *(আল-আনআম, ৬/৮৮)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হুঁশিয়ার করে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾ 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক করেন, তবে আপনার আমল (কাজ-কর্ম) নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(আয-যুমার ৩৯/৬৫)*।

শিরককারীর সকল সৎআমল বাতিল বলে গণ্য হবে। বিধায় তার শেষ পরিণাম তো আর ভালো হওয়ার সুযোগ নেই। তার কোনো আমলই অবশিষ্ট নেই। ফলশ্রুতিতে তার চূড়ান্ত ঠিকানা হবে জাহান্নামে। এ মর্মে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ 'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার স্থান হবে জাহান্নাম। আর এরূপ অত্যাচারীর জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না' *(আল-মায়েদা, ৫/৭২)*।

উপরের আয়াতে কারীমার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেননি যে, তাকে জান্নাতে দেব না বা জাহান্নামে দেব। বরং বলেছেন, তার জন্য জান্নাত হারাম। আর এরূপ নিকৃষ্ট ব্যক্তির অবধারিত ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। সে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত, ফলে সেদিন তার কোনো সাহয্যকারীও থাকবে না। শিরক জান্নাত ও জাহান্নামের মূল পার্থক্যকারী বিষয়। শিরক না করলে জান্নাত, আর শিরক করলে জাহান্নাম। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[২] জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৩] অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে— আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একটি কথা বললেন, আর আমি একটি বললাম। নবী করীম ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে। আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান না করা অবস্থায় মারা যায়? (তিনি বললেন), সে জান্নাতে যাবে।[৪] আবূ

২. ছহীহ বুখারী, হা/১২৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৯, ১/৬৬; মিশকাত, হা/৩৮।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/১২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮০, ৯৩; মিশকাত, হা/৩৮।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৯৭; মুসনাদে আহমাদ, হ/৩৫৫২।

www.al-itisam.com

হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তাহলে আমি ঐ শিরককারী ও তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি'।[৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِى أَشْرَكَ 'আমি তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং তার সম্পর্ক ঐ ব্যক্তির সাথে, যার সাথে সে শিরক করেছে'।[৬]

উক্ত হাদীছগুলোতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম। তাকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে বসবাস করতে হবে। তার জান্নাতে আসার কোনো সুযোগ থাকবে না। তবে মৃত্যুর পূর্বে খালেছ অন্তরে তওবা করার কারণে আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করতে পারেন। অন্যথা সে জাহান্নামেই চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। কেননা মহান আল্লাহ শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিধায় কেউ তার শরীক স্থাপন করলে তিনি তাকে তার শিরকসহ বর্জন করেন।

নিয়্যত অনুসারে সকল আমলের প্রতিদান পাওয়া যাবে :

মানুষের প্রতিটি কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি যা নিয়্যত করবে সে অনুরূপই ফলাফল পাবে। তাই বলা হয়ে থাকে, নিয়্যতগুণে বরকত হয়। কিংবা যেমন কর্ম তেমন ফল। এমর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'যারা পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা চায়, আমি তাদের কৃতকর্মের ফল পূর্ণভাবে দুনিয়াতেই দিয়ে দিব। এতটুকুও তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। এরা এমন যে, আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাদের সকল আমল তখন অকেজো এবং নিষ্ফল বলে বিবেচিত হবে' *(হূদ, ১১/১৫-১৬)*। তিনি অন্য আয়াতে বলেন, ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ 'কোনো ব্যক্তি পার্থিব কোনো সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা অতিসত্বর দিয়ে থাকি। অতঃপর আমি তার জন্য নির্ধারিত করে রাখি জাহান্নাম, যাতে সে প্রবেশ করবে অপমানিত ও লাঞ্ছিতভাবে' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/১৮)*। উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 'প্রত্যেক কাজ নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই-ই রয়েছে, যার জন্য সে সংকল্প করেছে। সুতরাং যার হিজরত দুনিয়লাভের আশায় কিংবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়েছে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হয়েছে যার জন্য সে হিজরত করেছে'।[৭] জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ 'মানুষকে তাদের নিয়্যত অনুসারে হাশরের ময়দানে একত্র করা হবে'।[৮] আরো একাধিক বর্ণনায় রয়েছে যে, 'শেষ দিবসে নিয়্যত অনুযায়ী মানুষকে উঠানো হবে'।[৯]

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চায়। অথচ তার উদ্দেশ্য দুনিয়া কামানো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তার কোনো ছওয়াব হবে না। লোকটি তাঁকে তিন বার এ কথাটি জিজ্ঞেস করলেন। আর তিনি প্রত্যেকবারই একই উত্তর দিলেন।[১০] ক্বাতাদা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, من كانت الدّنيا همّه ونيّته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدّنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدّنيا ويثاب عليها في الآخرة 'দুনিয়াই যার আশা, ভরসা, চাওয়া ও পাওয়া হবে, আল্লাহ তাআলা তার সকল নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দিবেন। আখেরাতের জন্য একটি সৎআমলও তার জন্য গচ্ছিত রাখা হবে না। তবে খাঁটি ঈমানদার তার সৎআমলের ফল দুনিয়াতেও পাবে, আখেরাতেও পাবে'।[১১]

মানুষের নিয়্যত অনুসারে প্রতিদান প্রদান করা হবে। বিশুদ্ধ নিয়্যতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করলে পুরোপুরি প্রতিদান পাবে। আর মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে খুশি করার জন্য বা লোক দেখানোর নিয়্যতে আমল করলে সবই বিফলে যাবে। ফলে বিচারের কঠিন দিবসে ক্ষতিগ্রস্তদের কাতারে শামিল হবে।

(চলবে)

---

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬৬৬; মিশকাত, হা/৫৩১৫।

৬. ইবনু মাজাহ, হা/৪২০২; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৯৮৭; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/৯৩৮; মিশকাত, হা/৫৩১৫, সনদ ছহীহ।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/১; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৩৬; মিশকাত, হা/১।

৮. ইবনু মাজাহ, হা/৪২৩০; মুসনাদে আহমাদ, হা/৯০৭৯; কানযুল উম্মাল, হা/৭২৪৫; ছহীহুল জামে', হা/৮০৪২, সনদ ছহীহ।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/২১১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪২৬; মিশকাত, হা/২৭২০।

১০. আবূ দাঊদ, হা/২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৮৮৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪৬৩৭; মিশকাত, হা/৩৮৪৫, সনদ ছহীহ।

১১. মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী, ছাফওয়াতুত তাফাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬; আত-তাফসীরুল মুনীর লিয-যুহাইলী, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৩৮।

www.al-itisam.com

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(শেষ পর্ব)

ভুল ধারণা-১০ : আহলেহাদীছগণ মুসলিমদের কুফরীর (কাফের) ফতওয়া দেয় :

কাউকে কাফের বলা, তার ব্যাপারে কুফরীর ফতওয়া দেওয়াকে তাকফীর বলা হয়। তাকফীর একটি সূক্ষ্ম এবং বড় যিম্মাদারীর বিষয়। কখনো এমনটি করা জরুরী হয়ে যায়। কিন্তু এটি এত বড় জটিল বিষয় যে, এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা অসর্তকতা এবং মূর্খতার উপর ভিত্তি করে কৃত ফয়সালা তাকফীরকারীকে (অন্যকে কাফের স্বীকৃতিদানকারীকে) আল্লাহর নিকট অপরাধী করে দেয়।

১. আহলেহাদীছদের মতে তাহক্বীক্ব ব্যতীত কাউকে কুফরীর ফতওয়া দেওয়া হারাম : আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ‘যে ব্যক্তি তার ভাইকে কাফের বলবে, তাদের দুজনের একজনের উপর তা বর্তাবে’।[১] ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ ‘যাকে কাফের বলা হয়েছে, যদি সে কাফের হয় তো হলোই, নতুবা কথাটি বক্তার উপরই ফিরে আসবে’।[২] ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় রয়েছে, إِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلَّا كَفَرَ بِتَكْفِيْرِهِ ‘যাকে কাফের বলা হয়েছে, সে যদি কাফের হয় তো হলোই, নতুবা সে এই কাফের বলার কারণে নিজেই কাফের হয়ে যাবে’।[৩]

বুঝা গেল যে, বাস্তবেই যদি ওই ব্যক্তি কাফের হয়, তাকফীরকারী নিজ যিম্মাদারী থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু বিষয়টি যদি তার উল্টো হয়, তাহলে অন্যকে কাফের বলার মাধ্যমে নিজেই কাফের হয়ে যাবে।

কখনো কখনো অজ্ঞতাবসত একজন মানুষ এমন আমল করে বসে, যা মূলত কুফর বা শিরক, কিন্তু সে তা না জানার কারণে করে থাকে। সে কুফরী এবং শিরক করা বৈধ মনে করে না; বরং এই আমলটি কুফরী বা শিরক তা তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও জানা নেই। এমন অবস্থায় আলেমের দায়িত্ব হলো, তাকে এই বিষয়ে অবগত করানো; তাকে কাফের ফতওয়া না দেওয়া। এর বর্ণনা নবী ﷺ-এর একটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়।

২. আমলের উপর বিধান কার্যকর করা এবং আমলকারীর উপর বিধান কার্যকর করা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় : আবূ ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ وَكَانُوْا أَسْلَمُوْا يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ فَمَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكُفُوْنَ حَوْلَهَا وَيُعَلِّقُوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يَدْعُوْنَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَلَمَّا قُلْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللهُ أَكْبَرُ وَقُلْتُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা হুনাইনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন আমরা সবে মুসলিম হয়েছি। (বর্ণনাকারী বলেন) এই লোকগুলো মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম হয়েছিলেন। তারা বললেন, আমরা একটি গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের যেমন যাতু আনওয়াত আছে, আমাদের জন্যও একটি যাতু আনওয়াত নির্ধারণ করে দিন। যাতু আনওয়াত কাফেরদের একটি গাছ ছিল, যার আশপাশে তারা একত্রিত হতো এবং যুদ্ধে বিজয় লাভ করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের তরবারীগুলো ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখত। আর এই গাছটিকে তারা যাতু আনওয়াত নামকরণ করেছিল। ছাহাবীগণ বলেন, এই কথা যখন নবী ﷺ-কে বললাম, তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! তোমরা সেই কথাই বললে, যে কথা বানু ইসরাঈল মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য একটা দেবতা গড়ে দিন, যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে!’ মূসা বলেছিলেন, ‘তোমরা মূর্খ জাতি।’ অবশ্যই তোমরা একটা একটা করে তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।[৪]

উক্ত ঘটনায় লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আল্লাহর নবী ﷺ ছাহাবীগণের যাতু আনওয়াত কামনা করাকে বানু ইসরাঈলের বাতিল উপাস্য কামনার সাথে তুলনা করেছেন। যেহেতু এই সকল মানুষ নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, ‘কিতাবুল আদাব’, হা/৬১০৪; ছহীহ মুসলিম ‘কিতাবুল ঈমান’, হা/৯১।

২. ছহীহ মুসলিম, ‘কিতাবুল ঈমান’, হা/৯২।

৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান; ছহীহ আত-তারগীব, হা/২৭৭৫।

৪. মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, জিলালুল জান্নাহ, হা/৭৬, ছহীহ।

www.al-itisam.com

অনেক বিষয় অজানা ছিল। এজন্যই মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাফের বলেননি। বরং তাদের আমলের উপর তাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, তাদের এই কাজ কতটা দণ্ডনীয় অপরাধ। সুতরাং অজ্ঞতাবসত কুফরী বাক্য বলে দিলে তাকে কাফের অ্যাখ্যা না দিয়ে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

৩. আহলেহাদীছদের মতে ঐ ব্যক্তি অপরাধী, যে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তা অস্বীকার করে : কখনো কখনো গবেষণা বা বুঝের ভুলের কারণে জ্ঞানী মানুষদের থেকেও এমন কোনো কথা বা কর্ম সংঘটিত হয়ে যায়, যার উপর কুফরীর হুকুম সাব্যস্ত করা যায়। তথাপি তার উপর কুফরীর হুকুম দেওয়া যাবে না। বরং ভুলকারী হিসাবে উল্লেখ করা হবে। ইবনু তায়মিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَأَمَّا التَّكْفِيْرُ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ لَمْ يُكَفَّرْ بَلْ يُغْفَرُ لَهُ خَطَؤُهُ وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ فَشَاقَّ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَصَرَ فِيْ طَلَبِ الْحَقِّ وَتَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ فَهُوَ عَاصٍ مُذْنِبٌ.

‘তাকফীরের ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি সঠিক বিষয় গবেষণা করতে গিয়ে যদি ভুল করে ফেলে, তাহলে তাকে এই ভুলের কারণে কাফের বলা যাবে না’। বরং আল্লাহ তাআলাও তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন। পক্ষান্তরে, কোনও ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা এবং হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যদি সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা করে এবং ঈমানদারদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে চলে, তাহলে এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং সত্য অন্বেষণের ক্ষেত্রে অলসতা প্রদর্শন করে আর অজ্ঞতার কারণে কিছু বলে দেয়; তাহলে এমন ব্যক্তি পাপী হিসাবে গণ্য হবে (কাফের নয়)।

বুঝা গেল, সত্য ও সঠিক বিষয় স্পষ্ট হওয়ার পরও তা অস্বীকার মানুষকে কাফের বানিয়ে দেয়। সুতরাং এমন ব্যক্তির কুফরী স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিশেষ করে যখন সে তার এই কুফরী চিন্তাকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রচার করে, তখন তাকে মুসলিম বলা দ্বীন ইসলামের মর্যাদার দুর্বলতা এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শনের নামান্তর। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর বিষয়টি তার স্পষ্ট উদাহরণ।

সুতরাং মনে রাখতে হবে, কোনো ব্যক্তির নিকট দলীল না পৌঁছার কারণে যদি সত্য ও সঠিক বিষয় অস্পষ্ট থেকে যায় অথবা দলীল বুঝার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার কারণে তার বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তার সামনে সত্যকে স্পষ্ট না করে তার উপর কাফের হয়ে যাওয়ার ফতওয়া দেওয়া কল্যাণ কামনা, দয়া, মহানুভবতা এবং বিচক্ষণতার বহির্ভূত বিষয়।

তাকফীরের (কাউকে কাফের বলার ক্ষেত্রে) আহলেহাদীছদের মানহাজ এটিই। কিন্তু যেহেতু অনেক মানুষ এই কথা বুঝার জন্য আহলেহাদীছ আলেমদের নিকট আসে না বা এই বিষয়ে লিখিত কিতাবাদি অধ্যয়ন করে না, সেজন্যই তারা ভুলের মধ্যে থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো আহলেহাদীছের নিকট শোনে এমনটি করা শিরক বা কুফরী, তখন সে বুঝে নেয় যে, আহলেহাদীছরা এই কর্মগুলোর সাথে জড়িতদের প্রত্যেককে কাফের বলে। কিন্তু বাস্তবতা এমনটি নয়। আহলেহাদীছদের মতে অজ্ঞ ব্যক্তির অস্বীকার করা আর জেনে-বুঝে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

সর্বশেষ কথা :

গবেষণা, জ্ঞান এবং কর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়পরায়ণতা অতি উচ্চ মানের গুণ। যে সকল মানুষ কোনো দল বা কোনো আদর্শিক চিন্তা-ভাবনার সাথে সম্পর্ক রাখে, তারা যদি গোঁড়ামি থেকে বের হয়ে এসে একনিষ্ঠভাবে গবেষণা করে আহলেহাদীছদের মানহাজ (পথ ও মত) বুঝার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, আহলেহাদীছদের মানহাজ কুরআন এবং সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে এবং আঙুল দ্বারা কান বন্ধ করে নেয় আর তারপর বিচার করতে চায়, তাহলে এমন ব্যক্তি থেকে কীভাবে সত্য ও ইনছাফ আশা করা যায়? (অর্থাৎ এমন ব্যক্তিদের থেকে সঠিক পরামর্শ ও দ্বীনী আমানতের ব্যাপারে ইনছাফের আশা করা যায় না)।

আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করি, তিনি যেন আমাদের প্রজ্ঞা এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে বিচার করার তাওফীক্ব দান করেন। তিনি আমাদের দূরদর্শিতাসম্পন্ন জ্ঞানী করেন এবং ঈমান ও আমলের উপর অটল রাখেন। আল্লাহ আমাদের ছিরাতে মুস্তাক্বীম তথা সঠিক পথের উপর মৃত্যু দান করুন- আমীন!

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَ لَكُمْ

একটি লিফলেটের ইলমী জবাব

-আহমাদুল্লাহ*

(পর্ব-৫)

৮. ফজর ও আসরের পর সুন্নাত না পড়া : এ ব্যাপারে মুহতারাম লেখক একটি হাদীছ পেশ করেছেন। তা হলো-

عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি নবীজি সা.-কে বলতে শুনেছি, ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায পড়া যাবে না এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায পড়া যাবে না। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৫৮৬)

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অবশ্যই ছহীহ। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো কথা নেই। কিন্তু ফজরের পূর্বে যদি দু'রাকআত সুন্নাত ক্বাযা হয়ে যায় তাহলে তা ফজরের ফরযের পর সাথে সাথে আদায় করে নিতে হবে।[১] উক্ত হাদীছে ক্বাযা সুন্নাতের ব্যাপারে নয়, বরং সাধারণ নফল ছালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে যোহরের কোনো সুন্নাত কিংবা আছরের পূর্বের চার রাকআত যদি বাদ পড়ে যায়, তাহলে তা আছরের ফরয ছালাতের পর পরই আদায় করা যাবে।[২] এছাড়াও তাহিয়াতুল মসজিদ, তাহিয়াতুল ওযূ, দুখূলুল মাসজিদ ইত্যাদি ছালাত আছরের পরও পড়া যায়। আর নবী ﷺ যে আছরের পর প্রতিদিন দু'রাকআত আদায় করেছেন, সেটি শুধুই তার সাথে খাছ; আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

৯. বিতর নামায তিন রাকআত পড়া : এ শিরোনামে বুখারীর একটি প্রসিদ্ধ হাদীছ পেশ করা হয়েছে। তা হলো-

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ﷺ أنه أخبره أنه سأل عائشة ﷺ كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان فقالت ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا.

হযরত আবু সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান রা. হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, রমজানুল মোবারকে নবীজি সা.-এর নামায কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, রমজান এবং রমজানের বাইরে তিনি এগারো রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না। প্রথমে চার রাকআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা অবর্ণনীয়। এরপর চার রাকআত পড়তেন, যার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা অবর্ণনীয়। এরপর তিন রাকআত বিতর পড়তেন। (বুখারী শরীফ, ১/১৫৪, মুসলিম, ১/২৫৪, নাসায়ী, ১/২৪৮)

জবাব : এই হাদীছ দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আহলেহাদীছগণ যে এক রাকআত বিতরের ছালাত আদায় করেন, তা ঠিক নয়। বরং বুখারীতে তিন রাকআত বিতরের কথা রয়েছে। সুতরাং তিন রাকআত বিতর পড়তে হবে। এক রাকআত বিতর পড়া যাবে না।

বস্তুত এটি খুবই হাস্যকর ও চরম অজ্ঞতাপূর্ণ দাবি। কেননা আহলেহাদীছগণ যেমন এক রাকআত বিতর আদায় করেন, অনুরূপভাবে তারা তিন রাকআত বিতরও আদায় করেন। সুতরাং এই হাদীছকে সালাফীদের বিরুদ্ধে পেশ করা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়। যেহেতু আহলেহাদীছগণ তিন রাকআত বিতরের হাদীছের উপর আমল করেন, সেহেতু এ হাদীছের কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও নেই। তবে যেহেতু এক রাকআত বিতরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়, সেহেতু নিচে এক রাকআত বিতরের ছালাতের পক্ষে কিছু হাদীছ পেশ করা হলো :

(১) নবী ﷺ এক রাকআত বিতর পড়েছিলেন।[৩] হানাফী মুহাক্কিক্ব আলেমে দ্বীন আল্লামা নীমাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এর সনদ ছহীহ'।[৪]

(২) ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এক রাকআত বিতর পড়তেন।[৫] নীমাবী এর সনদকে হাসান বলেছেন।[৬]

(৩) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এক রাকআত বিতর পড়েছিলেন।[৭]

(৪) মুআবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু এশার পর এক রাকআত বিতর আদায় করেছিলেন।[৮]

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. তিরমিযী, হা/১১৫১; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৫৮৮।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১২৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৩৪।
৩. দারাকুত্বনী, হা/১৬৫৬।
৪. আসারুস সুনান, হা/৫৯৭।
৫. দারাকুত্বনী, হা/১৬৫৭।
৬. আসারুস সুনান, হা/৬০৫।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৫৬।

www.al-itisam.com

(৫) আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিন রাকআত বিতর পড়তে চায়, সে যেন তিন রাকআত পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি এক রাকআত বিতর পড়তে চায়, সে এক রাকআত বিতর পড়ে নিক'।[৯]

(৬) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) এক রাকআত বিতর পড়েছিলেন।[১০]

(৭) ইমাম আতা ইবনু আবী রাবাহ বলতেন, 'যদি চাও, তাহলে এক রাকআত বিতর আদায় করো'।[১১]

(৮) আলে সা'দ এবং আলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার এক রাকআত বিতর ছালাত আদায় করতেন।[১২]

(৯) নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে এক রাকআত বিতর পড়ে নিতে বলেছেন।[১৩]

এ ব্যতীত এক রাকআত বিতরের পক্ষে আরও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

১০. দু ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তিন তাকবীর সহ প্রত্যেক রাকআতে চার তাকবীর : এ শিরোনামে নিচের হাদীছটি পেশ করা হয়েছে। যেমন-

أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله ﷺ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم.

হযরত সাঈদ ইবনুল আস বলেন, আমি হযরত আবু মূসা আশআরী রা. ও হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সা. ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামায প্রত্যেক রাকআতে কয় তাকবীর আদায় করতেন? উত্তরে হযরত আবু মূসা রা. বললেন, জানাযার নামাযের মত চার তাকবীর বলতেন (প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা ও দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর তাকবীরসহ)। হযরত হুযায়ফা রা. (হযরত আবু মুসা আশআরী রা.-এর কথার সত্যায়ন করে) বলেন, তিন সত্য বলেছেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. বলেন, আমি বসরায় গভর্নর থাকাবস্থায় সেখানেও এরূপ করতাম। (আবু দাউদ শরীফ ১/১৬৩, হাদীস নং ১১৫৩)

তাহক্বীক্ব : প্রথমত, হাদীছটি যঈফ। কেননা এর রাবী আবূ আয়েশা মাজহূল। তার সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায় না। শায়েখ আলবানী নিজেও তাকে অপরিচিত বলেছেন।[১৪] অপর রাবী ইবনু ছাওবানও বিতর্কিত।[১৫] সুতরাং হাদীছটির সনদ দুর্বল। আর হাদীছটির পক্ষে কোনো শাহেদ বা মুতাবাআতও নেই। সুতরাং হাদীছটির সনদ ও মতন উভয়ই যঈফ, যা দলীলের অযোগ্য। **দ্বিতীয়ত,** এটি মুযত্বারিব হাদীছ। এখানে মাওকূফ হাদীছকে মারফূ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যেমন ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এ বিষয়ে উপরিউক্ত ফতওয়া দেন।[১৬] মোটকথা, হাদীছটির সনদ যঈফ হওয়ার পাশাপাশি মতনও ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য হাদীছের পর্যায়ে পড়ে না।

১২ তাকবীর সম্পর্কে কতিপয় ছহীহ হাদীছ :

(১) আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 'রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন (রুকূর তাকবীর ব্যতীত)'।[১৭]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, التَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ 'ঈদুল ফিত্বরের প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর রয়েছে'।[১৮]

(৩) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, فِي تَكْبِيْرِ الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ 'ঈদায়েনের প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর রয়েছে'।[১৯]

(৪) আম্মার বর্ণনা করেছেন যে, كَبَّرَ فِي الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا ثُمَّ قَرَأَ وَكَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا 'ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) ঈদের ছালাতের প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিতেন। অতঃপর ক্বেরাআত পাঠ করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২০] এছাড়াও ১২ তাকবীরের পক্ষে আরও অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।[২১]

(চলবে)

৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৬৪, ৩৭৬৫।
৯. নাসাঈ, হা/১৭১৩, সনদ ছহীহ।
১০. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ৩/২৭, সনদ ছহীহ; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৬৮০৬, সনদ ছহীহ।
১১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৬৮১১, সনদ ছহীহ।
১২. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৬৮১২, সনদ ছহীহ।
১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৪৭২, ৪৭৩, ৯৯০, ৯৯৩, ৯৯৫, ১১৩৭।
১৪. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৯৯৭-এর আলোচনা দ্র.।
১৫. বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা/৬৮৮৩।
১৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৬১৮৩।
১৭. ইবনু মাজাহ, হা/১২৭৭-১২৭৯; তিরমিযী, হা/৫৩৬; মিশকাত, হা/১৪৪১।
১৮. আবূ দাঊদ, হা/১১৫১; আহমাদ, হা/৬৬৮৮; তিরমিযী, হা/৫৩৬।
১৯. শারহু মাআনিল আছার, হা/৭২৬৮; তারীখে বাগদাদ, হা/৩৪৯৩।
২০. ত্বাবারানী, হা/১০৭০৮; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৫৭০১, ৫৭২৪; শারহু মাআনিল আছার, হা/৭২৮১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৬১৮১।
২১. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/৬১৭৭, ৬১৭৯, ৬১৮০; কাশফুল আসতার, হা/৬৫৫; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৪৮৯৫; সুনানে দারাকুত্বনী, হা/১৭২৭; ইমাম মুহাম্মাদ, মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, হা/২৩৭; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৫৭১৮, ৫৭২০, ৫৭২১।

তাসবীহ পাঠের পদ্ধতি

-সাঈদুর রহমান*

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। ক্ষণিকের জন্য বান্দারা তাঁকে ভুলে যাক, এটা তিনি চান না। যাদেরকে তিনি এত সুন্দর করে সৃষ্টি করলেন, যাদের প্রতি এত মায়া-মমতা তাঁর; তারা তাঁকে ভুলে গেলে চলবে? এজন্যই তিনি বান্দার প্রতিটি কাজে দু'আ ও যিকির নির্ধারণ করেছেন। যেমন— কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা, খাবার শুরু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা, টয়লেটে যাওয়ার পূর্বে ও পরে নির্ধারিত দু'আ পড়া, ওযূ শুরু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা ও শেষে দু'আ পড়া, ঘুমানোর পূর্বে দু'আ পড়া, সকাল-সন্ধ্যার দু'আ পড়া; এমনকি স্ত্রী সহবাসেরও দু'আ আমাদের বাতলে দিয়েছেন।

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, এসব নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন বান্দা পার্থিব জীবনের মোহে পড়ে স্বীয় প্রভুকে ভুলে না যায়। দু'আ শিখানোর পাশাপাশি নবী ﷺ আমাদের কিছু যিকিরও শিখিয়েছেন। কারণ যিকির হলো আত্মার খোরাক, আত্মা এর মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন, ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ 'আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮)*। ছালাতের পর কিছু যিকির আছে। কা'ব ইবনু উজরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ.

'এমন কতগুলো তাসবীহ রয়েছে, যার পাঠকারী তার ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না, প্রত্যেক ছালাতের পর সে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল-হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবর ৩৪ বার বলবে'।[১] একদা নবী ﷺ-এর কলিজার টুকরা ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বিষণ্ন মন নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট একটি সেবক তলব করেন। কারণ সাংসারিক কাজ-কর্ম করতে গিয়ে তার শরীর একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় মলিনতার ছাপ উদ্ভাসিত হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ তার বাড়িতে গিয়ে কিছু যিকির শিখিয়ে ছিলেন, যা মোটা দাগে হাদীছের কিতাবগুলোতে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। পরবর্তীরা যেন এই মহীয়সী নারী থেকে সবক গ্রহণ করে এটাই ছিল ঐকান্তিক উদ্দেশ্য। হাদীছটি একটু দেখুন না!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا وَشَكَتِ الْعَمَلَ فَقَالَ مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا قَالَ أَلاَ أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ تُسَبِّحِينَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدِينَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা একজন খাদেমের জন্য নবী ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং অনেক কর্মের অভিযোগ করলেন। তিনি ﷺ বললেন, 'আমার নিকটে তো কোনো খাদেম নেই। তিনি বললেন, তবে আমি কি তোমাকে এমন বিষয়ের নির্দেশনা করব না, যা তোমার খাদেমের তুলনায় অতি উত্তম? যখন তুমি শয্যাগ্রহণ করবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নিবে'।[২]

আরও অনেক যিকিরে টইটম্বুর হাদীছের গ্রন্থগুলো। মানুষ ইচ্ছা করলে সার্বক্ষণিক কোনো না কোনো যিকিরে মশগূল থাকতে পারবে। এখন কথা হলো এই যিকিরগুলো আমরা কীভাবে সম্পাদন করব— হাতের আঙুলের মাধ্যমে, না-কি পুঁথির তাসবীহদানা দিয়ে? মনে রাখতে হবে, আমাদের ওইভাবে আমল করতে হবে, যেভাবে রাসূল ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। নিজ খেয়াল-খুশি মতো করে করলে চলবে না। ভাই, আমরা ইবাদত করি কেন বলতে পারবেন? আপনি অবশ্যই বলবেন, আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার আশায়। তাহলে তো ভাই রাসূল ﷺ-এর বাতলানো পন্থায় আমল সম্পাদন করতে হবে। আল্লাহর আস্থাভাজন হওয়া যায় একমাত্র রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে। দেখুন, আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর করে বলেছেন, যা হৃদয়ের পরতে পরতে দাগ কাটে! আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. নাসাঈ, হা/১৩৪৯, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮১১।

‘(হে নবী) বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ও পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু’ *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

আমাদের এত কষ্টের আমল যদি আল্লাহর কাছে গৃহীত না হয়, তাহলে করে কী লাভ! দেখুন নবী ﷺ কীভাবে তাসবীহ পাঠ করতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِينِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আঙুলে গুনে গুনে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি। ইবনু কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ডান হাতের আঙুল দ্বারা।[৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ.

আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘অবশ্যই তোমরা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাক্বদীস (সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ অথবা সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস) আঙুলের গিরায় হিসাব করে পড়বে। কেননা এগুলোকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে এবং কথা বলতে আদেশ দেওয়া হবে। সুতরাং তোমরা রহমত (অনুগ্রহের কারণ) সম্পর্কে উদাসীন থেকো না এবং তা ভুলে যেও না’।[৪]

এখন কথা হলো, কেন আমরা আঙুল দিয়ে তাসবীহ পাঠ করব? এর হেতুও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ‘সেদিন (কিয়ামতের দিন) তারা যা করেছে, সে সম্পর্কে তাদের মুখ, হাত ও পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে’ *(আন-নূর, ২৪/২৪)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ‘আজ আমরা তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দিব, ফলে তাদের হাত-পা যা করেছে সে ব্যাপারে আমাদের সাথে কথা বলবে’ *(ইয়াসিন, ৩৬/৬৫)*।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ ‘হে নারীকুল! আঙুল দ্বারা তাসবীব পড়বে। কেননা (কিয়ামতের দিন) এগুলো জিজ্ঞেসিত হবে ও কথা বলবে’।[৫]

আমরা যদি হাতের দ্বারা তাসবীহ পাঠ করি, তাহলে বিভীষিকাময় কিয়ামতের দিন এই হাত আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে। কোমল স্বরে বলবে, ‘দয়াময় হে! দিয়ো না তোমার এই বান্দাকে তমসাচ্ছন্ন জাহান্নামের প্রকোষ্ঠে। সহ্য করতে পারবে না সে। সে আমাকে দিয়ে তোমার পবিত্র নাম জপেছে। তাকে জাহান্নামে দিলে তোমার নামের অপমান হয়। করুণা করো প্রভু তার তরে’। সুতরাং আমাদের উচিত হাত দিয়ে তাসবীহ পাঠ করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডান হাতের কনিষ্ঠাঙুলি দিয়ে তাসবীহ পাঠ করতে হবে। অনেককে দেখা যায় বৃদ্ধাঙুলি দিয়ে তাসবীহ পাঠ করে— এটা ঠিক নয়। নবী ﷺ প্রতিটি ভালো কাজ ডান দিয়ে শুরু করতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। ত্বহারাত অর্জন, মাথা আঁচড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও।[৬] কারো যদি ডান হাত কাটা থাকে বা ডান হাতের আঙুল না থাকে, তাহলে বাম হাতের আঙুল দিয়ে তাসবীহ পাঠ করতে পারবে। একটা ফিক্বহী মূলনীতি হলো, الضرورات تبيح المحظورات ‘জরুরী প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ করে দেয়’। এখন একটু পুঁথির দানা দিয়ে তাসবীহ পাঠ করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো দেখি।-

(১) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى، تُسَبِّحُ بِهِ.

(১) সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে কোনো এক মহিলার কাছে যান। ওই সময় মহিলার সামনে বীচি বা কঙ্কর ছিল, যার দ্বারা সে তাসবীহ পাঠ করত।[৭] হাদীছটি যঈফ।[৮]

৩. আবূ দাঊদ, হা/১৫০২, হাদীছ ছহীহ।
৪. তিরমিযী, হা/৩৫৮৩, হাদীছ হাসান।
৫. তিরমিযী, হা/৩৪৬৮, হাদীছ হাসান।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৪২৬।
৭. আবূ দাঊদ, হা/১৫০০, হাদীছ যঈফ।
৮. প্রাগুক্ত; হাদীছটি দুর্বল, তুহফাতুল আহওয়াযী, ৯/৩, হা/৩৪৮৬-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

(٢) عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا.

(২) ছফিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসেন। আর ওই সময় আমার সামনে ৪ হাজার বীচি ছিল, যার দ্বারা আমি তাসবীহ পাঠ করতাম।[৯] এই হাদীছ বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছে হাশেম ইবনু সাঈদ আল-কুফী রয়েছে, তার সনদ অপরিচিত।[১০]

(٣) أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُسَبِّحُ بِالْحَصَى.

(৩) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কঙ্কর দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতেন'।[১১] ইবনু সা'দ 'ত্বাবাক্বাত' নামক গ্রন্থে এ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাদীছের সনদ বিচ্ছিন্ন।[১২] এরকম আরো অনেকগুলো হাদীছ রয়েছে, যার কোনোটাই দুর্বলতা ও সমালোচনা থেকে মুক্ত নয়।

অতএব, আঙুল দ্বারা তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত ও উত্তম। কারণ এ ব্যাপারে ছহীহ ও হাসান হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বীচি, কঙ্কর বা পুঁথির দানা দিয়ে তাসবীহ পাঠ করা সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে কোনোটিই মন্তব্য থেকে মুক্ত নয়। তাই আমাদের উচিত হবে, ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সুবোধ দান করুন- আমীন!

৯. তিরমিযী, হা/৩৫৫৪, হাদীছ যঈফ।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. নায়লুল আওতার, ২/৩৬৬।
১২. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৯/৩২২।

মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষাবিস্তারে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

-মো. আরিফুর রহমান*

আমাদের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিভাবকরা সচেতন হচ্ছেন। দরিদ্রতা, কম আয়, গ্রামে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন— এ এক বিশাল সামাজিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের স্রোতে মাধ্যমিক স্তরের মোট ১,০৪,৭,১০০০ শিক্ষার্থীর বড় অংশকে যদি মানসম্মত শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা যায়, সেটা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ২০১৯ সালের সরকারি হিসাব মতে, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মেয়ে এবং ছেলের হার ৫৪:৪৬। মাধ্যমিক স্তরে ১,০৪,৭,১০০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৬,৫৫,৩৮১ জন অর্থাৎ ৫৪% হলো মেয়ে শিক্ষার্থী। ১৯৯৯ সালে মেয়েদের হার ছিল ৪৩% এবং ২০০৯ সালে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ছিল ৫১.৬১%। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা এবং বেসরকারি প্রকল্প পরিচালনার ফলে অভিভাবকরা সচেতন হয়েছেন। যে মেয়েদের কয়েক বছর পূর্বেও অভিভাবকরা স্কুলে ভর্তি করতেন না, প্রয়োজন নয় এবং অর্থের অপচয় মনে করতেন, এখন মাধ্যমিক স্তরে সেই মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে বেশি।[১]

এখানে আমি ২০১৯ সালের তথ্য প্রদান করলাম। ২০২০ এবং ২০২১ সালে করোনাকালে কী পরিমাণ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে, তা স্কুল পুরোপুরি চালু না হলে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

এই বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীকে যে কোনো মূল্যে মানসম্মত শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। মিলিনিয়াম ডিভলপমেন্ট গোল এর লক্ষ্যও তাই। যে চিরাচরিত নিয়মে আমরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করছি, তা থেকে বের হয়ে আসার সময় এখনই। একটি ছেলে বা মেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে সে যেন তার আচরণে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তার চরিত্র যেন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, সে যেন অফিস বা পরিবার বা সামাজিক বা ব্যক্তি জীবনে যে কোনো সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেই রকম শিক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে পরিবার, স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কমিউনিটি, অভিভাবক প্রত্যেকের সরকারকে সহযোগিতা করা কর্তব্য। এই দায়িত্বে অবহেলা করলে এই বিশাল মানবসম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে এবং দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। করোনা মহামারিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের মতো দেশের শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নিতে এখন থেকেই কাজ শুরু করা দরকার। শুধু কাজ শুরু করা নয়; মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ প্রত্যেককে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। নিজেদের মধ্যে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ'[২]-এর একজন কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার বিস্তার নিয়ে

---

* প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ এবং সাবেক ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. দ্য ডেইলি স্টার, ২০ এপ্রিল, ২০১৯।

২. ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব বাংলাদেশ), আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। জাতিসংঘের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ইউ.এন. ভলান্টিয়ার্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. এ.টি রফিকুর রহমান ১৯৯৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৯ সাল থেকে ফান্ড সংগ্রহ শুরু করে এবং ২০০০ সাল থেকে ১০টি স্কুলের ১০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তির আওতায় নিয়ে এসে ১০,০০০ ডলার সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশে এর যাত্রা শুরু। ২০০৬ সালে একটা বিদেশি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ভাব এন.জি.ও. ব্যুরোর নিকট থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করে। বাংলাদেশে শুধু মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নিবেদিত একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভাব। এ সংস্থাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বেচ্ছাসেবী উপদেষ্টা পরিষদ। অত্যন্ত দক্ষ স্বল্প সংখ্যক জনবল এবং একদল নিবেদিত ভলান্টিয়ার দক্ষতা ও জবাবদিহিতার সাথে নূন্যতম বাস্তবায়ন ব্যয়ে এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করছে।

'উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী এবং স্কুলের ক্ষমতায়ন' এই লক্ষ্যে Quality, Sustainability এবং Employability অর্জনের জন্য ভাব শিক্ষাক্ষেত্রে তার ক্ষমতায়ন মডেলের উৎকর্ষের জন্য কাজ করে। এই মডেলের অংশগুলো যেমন— শিক্ষার্থীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষকের ক্ষমতায়ন, বিদ্যালয়ের ক্ষমতায়ন ও কমিউনিটির ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ভাব বাংলাদেশ কর্মসূচি চলমান রেখেছে। শিক্ষার্থীদের বিতর্ক প্রশিক্ষণ, ইংরেজি ভাষা দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মশালা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ফুটবল, ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ফলে ইংরেজি, কম্পিউটার, বিতর্কে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা সফলতা অর্জন করছে। যা গ্রামীণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য বিশাল অর্জন। ২০১৯ সালে ভাব এর প্রকল্পভুক্ত ১০টি স্কুল কম্পিউটারে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করেছে। প্রকল্পভুক্ত গ্রামের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা বিটিভিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। ভাব এখন 'মানসম্মত শিক্ষার টেকসই ক্ষমতায়ন মডেল'-এর আলোকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ৮০টির বেশি স্কুলে কাজ করছে। এটি সংস্থাটির নিজস্ব শিক্ষা মডেল, যা বাংলাদেশের শিক্ষানীতির সাথে সংগতিপূর্ণ।

www.al-itisam.com

ছাত্রজীবন থেকেই আমার কাজ কারার অভিজ্ঞতা আছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পরিচালনা পর্ষদ, অভিভাবক, কমিউনিটি এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা একবারে কাছ থেকে দেখেছি। এই প্রবন্ধে শিক্ষা কী, মানসম্মত শিক্ষা কী, মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। শুধু যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটার প্রয়োজন তা নয়; মাদরাসার সুপার বা প্রাথমিক বিদ্যালয় এমনকি কলেজের অধ্যক্ষও এখান থেকে উপকৃত হতে পারেন। আর একটা কথা বলে রাখতে চাই, আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী অনেক কিছু জানেন কিন্তু সেগুলোর যথাযথ অনুশীলন তাদের অধিকাংশ করেন না।

শিক্ষা কী?

Merriam Webster dictionary তে শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তার মূল ভাব হলো, শেখানোর প্রক্রিয়া বা কাজকে শিক্ষা বলে। বিদ্যার একটি শাখা যেটি প্রতিষ্ঠানে শিখন-শেখানো পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে।

Wikipedia বলছে, শিক্ষা শিখন সুবিধা প্রদান করার প্রক্রিয়া অথবা জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অভ্যাস অর্জনের একটি প্রক্রিয়া। শিক্ষার পদ্ধতি হলো— গল্প বলা, আলোচনা, শেখানো, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা। শিক্ষাপ্রক্রিয়া সাধারণত একজন নির্দেশক বা শিক্ষকের অধীনে সম্পন্ন হয় এবং শিক্ষার্থীদের নিকট হতেও শিক্ষক শেখেন। শিক্ষাদান ও বিতরণ আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। যে কোনো অভিজ্ঞতা যার গঠনমূলক প্রভাব আছে চিন্তা, অনুভব অথবা কাজের উপর, তাকেও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় বলা যায়। শিক্ষা দানের পদ্ধতিকে (Methods) শিক্ষাবিজ্ঞান (Pedagogy) বলা হয়।

Wikipedia থেকে আমরা শিক্ষা কী, কীভাবে এটি সম্পন্ন হয়, সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পেলাম। আমরা বলতে পারি, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় কোনো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলির পূর্ণ বিকাশের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সকল দক্ষতা প্রয়োজন, সেগুলো অর্জনে সহায়তা করা হয়। সাধারণ অর্থে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা হলো সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটি এসেছে 'শাস' ধাতু থেকে। যার অর্থ শাসন করা বা উপদেশ দান করা। অন্যদিকে শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ Education এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educare বা 'এডুকাতুম' থেকে। যার অর্থ বের করে আনা অর্থাৎ ভেতরের সম্ভাবনাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা বা বিকশিত করা। তবে শুধু শাসন বা উপদেশ দানের প্রক্রিয়াকে এখন আর শিক্ষা বলার সুযোগ নেই। শিক্ষা যে কোনোভাবেই মানুষ অর্জন করতে পারে। বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের লেকচারের উপর কি শুধু শিক্ষা অর্জন নির্ভর করে? না। শিক্ষা হলো জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া। সেটা হতে পারে শ্রেণিকক্ষে, রাস্তার কোনো একটা বিলবোর্ড থেকে। হতে পারে ইউটিউবে বা ইন্টারনেটে বা যে কোনো মাধ্যমে।

মানসম্মত শিক্ষা কী?

Tony Wagner তাঁর ২০১৮ সালে প্রকাশিত The Global Achievement Gap বইয়ে একুশ শতকে টিকে থাকার জন্য সাতটি দক্ষতা চিহ্নিত করেছেন আর এইগুলো মানসম্মত শিক্ষা দ্বারা লালিত হয়ে থাকে। সেগুলো— গঠনমূলক চিন্তা ও সমস্যা সমাধান, সহযোগিতা ও প্রভাব বিস্তারকারী নেতৃত্ব, তৎপরতা ও অভিযোজ্যতা, মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের কার্যকর দক্ষতা, তথ্যের জগতে প্রবেশ ও বিশ্লেষণ, কৌতূহল ও কল্পনাশক্তি।

২০১৬ সালে প্রকাশিত Robinson তাঁর বইয়ে আটটি 'C' চিহ্নিত করেছেন, যা গুণগত শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট। সেগুলো হলো— Curiosity, Creativity, Criticism, Communication, Collaboration, Compassion, Composure and Citizenship.

আমাদের স্কুলগুলোও পুরোপুরি না বুঝে বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশিকা বাস্তবায়নে এই যোগ্যতাগুলোই অর্জন করতে কাজ করে। শ্রেণিতে পাঠ্যবই পড়িয়ে ও পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয় মানসম্মত শিক্ষার এই যোগ্যতাগুলো অর্জিত হয়েছে কি-না। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলের শত শত শিক্ষার্থীর জন্য যে মূল্যায়ন পদ্ধতি আছে, তাতে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং টিকে থাকার জন্য যেসব দক্ষতা দরকার, তা অর্জিত হয়েছে কি-না মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন। পাবলিক পরীক্ষা বা স্কুলের নিজস্ব পরীক্ষার মাধ্যমে কত নাম্বার পেয়েছে, ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছে কি-না, গাইড বইয়ে যা আছে বা পাঠ্য বই অনুযায়ী উত্তর দিয়েছে কি-না তা পরখ করে দেখা হয়। সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান, গঠনমূলক চিন্তা, কার্যকর মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগের

দক্ষতা, তথ্যজগতে প্রবেশ ও তথ্য বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার দক্ষতা কয়জন স্কুল শিক্ষার্থী অর্জন করে? গ্রামাঞ্চলের শত শত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষকও কি এই যোগ্যতাসমূহ অর্জন করার সুযোগ পান? তারা যে প্রশিক্ষণ পান তা কি যথেষ্ট এই সব যোগ্যতা অর্জন করার জন্য? এই যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ট্রান্সফার করার জন্য তারা কি প্রস্তুত? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করার সময় আমাদের এসে গেছে।

শিক্ষক স্কুলে আসবেন। ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে ক্লাস শুরু করবেন। আর এক ঘণ্টা বাজলে ক্লাস শেষ করবেন। সামনের বেঞ্চে দুই চার জনের মৌখিক মূল্যায়ন করবেন। মাস ও বছর শেষে পরীক্ষা নিবেন আর কে কত নাম্বার পেলো তা দেখবেন, তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবেন এই দিন শেষ। দ্রুতধাববান সভ্যতার সাথে টিকে থাকার জন্য বৈশ্বিক যোগাযোগ টিকিয়ে রাখতে তথ্যজগতে প্রবেশ এবং তা বিশ্লেষণ দক্ষতা অর্জনে কাজ শুরু করতে হবে এখনই; আজই। এই যোগ্যতা অর্জন করতে আমরা কেমন শিক্ষা চাই? মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে প্রধান শিক্ষক কী ভূমিকা রাখতে পারেন? তিনিই বা কেমন হবেন? আসুন! সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করি।

প্রধান শিক্ষক কেমন হবেন তা ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব বাংলাদেশ) এর ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা সদ্য প্রকাশিত বই Quality Education for Rural Bangladesh—এ তুলে ধরা হয়েছে।

একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হলো, স্কুলকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে, যেমন প্রধানশিক্ষক তেমন স্কুল।

প্রধান শিক্ষকের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলির সংমিশ্রণ থাকা জরুরী।

অংশীদারদের ক্ষমতায়নের গুরুত্ব বুঝতে পারা : প্রধান শিক্ষক বুঝতে পারবেন স্কুল কমিউনিটির একটি প্রতিষ্ঠান। স্কুল কমিউনিটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। কমিউনিটির বাচ্চাদের শিক্ষাসেবা প্রদান করে থাকে। প্রধান শিক্ষককে বাবা-মা ও কমিউনিটির সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং স্কুলের রূপকল্প পূরণে তাদের অংশীদারিত্ব অর্জন করতে হবে। তিনি অবশ্যই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং বিশেষত তাদের নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকার মধ্যে একটি সাধারণ পরিবেশ তৈরি করবেন।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা থাকতে হবে : প্রধান শিক্ষককে অবশ্যই নেতা (রাজনৈতিক নেতা নয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্কুলের স্টাফসহ কমিউনিটিকে বুঝতে সক্ষম হবেন) হতে হবে। স্কুলের জন্য অবশ্যই তার রূপকল্প থাকবে। লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কর্মপরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। রূপকল্প এগিয়ে নিতে তাঁর অনুসরণকারীদের দরকার, অধীনস্তদের নয়। তিনি কাজের প্রতি অনুরাগ এবং লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়তার সংমিশ্রণে আবেগের সাথে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটিকে অনুপ্রাণিত করবেন।

ঝুঁকি নেওয়ার মনোবল : নির্দেশনামূলক শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ত বিবর্তিত হয়। প্রযুক্তি শিক্ষার পরিবেশকে ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন করবে। শিক্ষার লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে নতুন ধারণা এবং চিন্তাভাবনা বাজারের শক্তির পরিবর্তনের সাথে উদ্ভূত হবে। স্কুলকে নতুন কৌশল এবং পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষককে অবশ্যই নতুন পানির স্রোতে গা ভেজানোর, শিক্ষকদের ঝুঁকি নেওয়ার ও ঝুঁকি পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়ার সাহস থাকতে হবে।

ইতিবাচক আচরণ ও উচ্চ প্রত্যাশা : স্কুলের প্রতি প্রধান শিক্ষকের ইতিবাচক মনোভাব থাকবে। এর শক্তি— শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বাবা-মা এবং কমিউনিটির ক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখবেন। তিনি অবশ্যই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করবেন এবং তাঁকে অন্যদের মধ্যে ইতিবাচকতা তৈরি করতে হবে। উচ্চ প্রত্যাশা পূরণের জন্য একটি সহযোগী পরিবেশ তৈরি করা উচিত।

কোনো শিক্ষার্থী খারাপ শিক্ষার্থী নয় এবং কোনো শিক্ষকই খারাপ শিক্ষক নন (No student is a poor student and no teacher is a poor teacher) আমরা এই ধারণা প্রচার করি। আরও প্রচার করি সমাজের কোনো ব্যক্তি অশিক্ষিত নয় (No individual in society is uneducated)। নিরক্ষর ও অশিক্ষিত দুটো আলাদা বিষয়।

অবিচল থাকতে হবে : সাফল্যের জন্য নতুনত্ব প্রয়োজন। প্রয়োজন সমন্বয় এবং সময়। পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। প্রধান শিক্ষক অবশ্যই একজন চমৎকার শিক্ষানবিস হবেন এবং সমস্ত উৎস থেকে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষানবিস হতে হবে। নতুন পদক্ষেপ ও নতুন ধারণাগুলো কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বৃহত্তর ফলাফল অর্জনের জন্য ছোট ব্যর্থতাগুলোকে অভিজ্ঞতা অর্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। প্রধান শিক্ষকের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে অপরিহার্য।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মূর্খদের সাথে বিতর্ক : শরীআত কী বলে?

-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন*

মূর্খদের সাথে বিতর্ক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ ‘তারা যখন নিরর্থক কথাবার্তা শুনে তখন তা উপেক্ষা করে, তা থেকে বিরত থাকে আর বলে, আমাদের আমলের ফল আমরা পাব, তোমাদের আমলের ফল তোমরা পাবে, তোমাদের প্রতি সালাম, অজ্ঞ বা মূর্খদের সাথে আমাদের বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই’ *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৫৫)*। এই আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মূর্খদের সাথে তর্কে না জড়ানোই ভালো।

মূর্খদের সাথে তর্ক করতে গেলে অযথাই আমাদের সময় নষ্ট হবে, তর্কের ফলাফল হবে আমাদের পরিশ্রান্ত হয়ে পড়া, এমনকি মাঝে মধ্যে তা রূপ নিতে পারে চরম বিশৃঙ্খলায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি-আমি দলীল চাইলে সে পাল্টা প্রশ্ন করে বসবে দলীল কী? আর তার ভুলটা ধরিয়ে দিতে চাইলে সে জানতে চাইবে আপনি সঠিকটা করেন তো? ছহীহ হাদীছ থেকে বললে যদি তা তার পূর্বের জানা বিষয়ের বিরুদ্ধে যায় তবে সে আপনাকে-আমাকেই মূর্খ টাইটেল দিবে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে কাফের-ইয়াহূদীদের দালাল সাব্যস্ত করতেও সময় নিবে না।

কাজেই মূর্খদের সাথে কোনো বিতর্ক নয়। আমাদের কাজ হলো তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, বিতর্ক করা নয়। তারপরও যদি তারা বিতর্ক করতে চায়, তখন কুরআনের ভাষায় বলতে হবে ‘সালাম’। আর তারপরই তাদের থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে। আশা করি বিষয়টি আপনাদের বোধগম্য হয়েছে।[১] অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোনো অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ করো, আমি অজ্ঞদের সাথে তর্কে জড়াতে চাই না। ইমাম জাসসাস বলেন, সালাম দুই প্রকার :

(১) মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম।

(২) সন্ধি ও বর্জনামূলক সালাম। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না।

এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ ‘আর রহমানের বান্দা তারাই, যারা যমীনে অত্যন্ত নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করলে তারা বলে, ‘সালাম বা শান্তি’ *(আল-ফুরকান, ২৫/৬৩)*। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে।

هَوْن শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য, বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা, অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে না চলা, গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর মতো চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা না করা। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির মতো। তবে খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নাত বিরোধী। হাদীছ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুত গতিতে চলতেন। হাদীছের ভাষা এরূপ, كَأَنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى لَهُ অর্থাৎ ‘চলার সময় পথ যেন তার জন্য সংকুচিত হতো’।[২] এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বলল, না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন।[৩]

হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ আয়াতের তাফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কান, হাত, পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ

---

* পিএইচডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. **বি.দ্র.** এখানে মূর্খ বলতে একাডেমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করেনি তাদেরকে বোঝানো হয়নি। একাডেমিক পর্যায়ে না পড়লেও শিক্ষিত হওয়া যায়। আবার অনেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পরেও মূর্খই রয়ে যায়।

২. ইবনু হিব্বান, হা/৬৩০৯, সনদ ছহীহ।

৩. ইবনু কাছীর, ৬/১১০।

www.al-itisam.com

ও পঙ্গু মনে করে, অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লহভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। পার্থিব কাজকর্ম তাদেরকে আখেরাতের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত রাখে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই ভোগ করে। কারণ সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং আখেরাতের কাজেও অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নেয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরি রয়েছে।[৪]

আর যখন জাহেল ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, 'সালাম'। এখানে جَاهِلُون শব্দের অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ করে ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে তারা বিদ্বান বটে। মূর্খ মানে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া না জানা লোক নয়; বরং এমন লোক যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোনো ভদ্রলোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। রহমানের বান্দাদের পদ্ধতি হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না।[৫] যেমনভাবে কুরআনের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ 'আর যখন তারা কোনো বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। আর বলে, আমাদের কাজের ফল আমরা পাব এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের উপর, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না' *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৫৫)*।

মানুষের সাথে কথা বলার দিকনির্দেশনা :

মানুষের সাথে একজন মুসলিম কীভাবে কথা বলবেন, সে বিষয়ে ইসলাম কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করে দিয়েছে। সর্বাবস্থায় একজন মুসলিমকে অটুট বিশ্বাস নিয়ে মনে রাখতে হবে যে, তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি যদি উত্তম কিছু বলেন, তিনি পুরস্কৃত হবেন। আর তিনি যদি মন্দ কিছু বলেন, তবে সেই মন্দ কথার জন্য তাকে অবধারিতভাবেই শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের জন্য তার নিকটে একজন সদা তৎপর প্রহরী রয়েছে' *(ক্বাফ, ৫০/১৮)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মুখের কথা খুবই বিপজ্জনক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'বান্দা অনেক সময় এমন কথা বলে যাতে সে গুরুত্ব দেয় না অথচ সেই কথা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ফলে আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে, বান্দা অনেক সময় এমন কথাও বলে যাতে সে গুরুত্ব দেয় না অথচ সেই কথা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। ফলে সে কথাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে'।[৬]

কাজেই মূর্খের কথা বিপদের কারণ হতে পারে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের সীমারেখার মধ্যে থেকে আমাদেরকে কথা বলা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মুখের কথা নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু দিকনির্দেশনা :

(১) কথা বলার উদ্দেশ্য হতে হবে উত্তম এবং কল্যাণকর। যদি উত্তম কথা বলার উদ্দেশ্য বজায় রাখতে না পারেন, তবে চুপ থাকাই আপনার জন্য উত্তম এবং চুপ থাকাটাও একটি উত্তম কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, নয়তো চুপ থাকে'।[৭]

(২) কথাবার্তায় সত্যবাদী হোন এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ মুমিন ব্যক্তি সর্বদায় সত্যবাদী যিনি কৌতুক করেও মিথ্যা বলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কারণ সত্য কল্যাণের দিকে এবং কল্যাণ জান্নাতের পথে চালিত করে। যে সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্যকে গুরুত্ব দেয়, আল্লাহর নিকট তার নাম সত্যবাদীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। কারণ মিথ্যা পাপের দিকে এবং পাপ জাহান্নামের আগুনের দিকে চালিত করে। যে অনবরত মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহর নিকট তার নাম মিথ্যাবাদীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়'।[৮]

(৩) কথাবার্তার মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না, তা ক্রীড়াচ্ছলেই হোক অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই হোক।

৪. ইবনু কাছীর, ৬/১১০।
৫. ফাতহুল ক্বাদীর, কুরতুবী, বাদাইউত তাফসীর।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৭, ৬৪৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৮।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৩৬, ৬৪৭৫।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৭।

কারণ আল্লাহ অবাধ্য ও মন্দভাষীকে ঘৃণা করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন এমন প্রতিটি শব্দের মাধ্যমেই কুফরী করা হয়। যেমন- অশ্লীল ও অশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করা, মানুষকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা ইত্যাদি। এ সম্পর্কে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছে নবী ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, 'মুমিনগণ কখনো অভিযোগ করে না, অন্যের প্রতি খারাপ ভাষা ব্যবহার করে না, আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং নোংরা ভাষায় কথা বলে না'।[৯] অন্য একটি ছহীহ হাদীছে রয়েছে, মুসলিমের জন্য গালিগালাজ করাই হলো কুফরী। জীবিত কোনো মানুষকে গালিগালাজ করা যেমন নিষিদ্ধ, মৃত ব্যক্তিকে গালিগালাজ করাও তেমনিভাবে নিষিদ্ধ। হাদীছে এসেছে, 'মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করবে না; তারা তাদের প্রতিদান পেয়ে গেছে'।[১০]

(৪) কথা বলার সময় গীবত তথা পরচর্চা থেকে বেঁচে থাকুন। গীবত হলো কোনো মুসলিমের অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে অন্য কারো কাছে এমন কিছু বলা যা শুনলে সে কষ্ট পেত। অতএব, পরচর্চা করবেন না। নামীমা থেকেও বেঁচে থাকুন। নামীমা হলো লোকজনের মধ্যে এমন তথ্য ছড়ানো যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণার সৃষ্টি করে। ছহীহ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। যারা নামীমা চর্চা করে তাদেরকে গোপনে নিষেধ করুন এবং সেগুলো শোনা থেকেও দূরে থাকুন। অন্যথা শুধু শোনার জন্যও আপনি সেই পাপের অংশীদার হবেন।

(৫) কথায় কথায় কসম খাওয়া থেকে বেঁচে থাকুন। এই মর্মে সূরা আল-বাক্বারাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ 'আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না' *(আল-বাক্বারা, ২/২২৪)*।

(৬) নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিসীমার মধ্যে থেকে কথা বলুন। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করবেন না। সূরা আল-ইসরাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 'যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ের পিছে পড়ো না' *(আল-ইসরা, ১৭/৩৬)*।

(৭) তদন্ত করে নিশ্চিত না হয়ে শুধু শোনা কথা নিয়ে মানুষের সাথে আলাপ করা যাবে না। কারণ আপনি এমন কিছু শুনতে পারেন, যেটা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যা কিংবা সন্দেহজনকও হতে পারে। যা শুনবেন তাই প্রচার করলে আপনিও পাপের অংশীদার হবেন। একটি ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন, 'একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচায় ব্যতীত) তাই প্রচার করে বেড়ায়'।[১১]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

৯. তিরমিযী, হা/১৯৭৭, হাদীছ ছহীহ।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৩, ৬৫১৬।
১১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫; আবূ দাঊদ, হা/৪৯৯২।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্ভিত্তিক বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে পরিচালিত একটি উন্নতমানের কওমী মাদরাসা।

দারুস্ সুন্নাহ্ মহিলা মাদ্‌রাসা ও ইয়াতীমখানা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ভর্তি ফরম বিতরণঃ ০১লা ডিসেম্বর হতে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত

ভর্তি পরীক্ষাঃ ০৩রা জানুয়ারি ২০২২ সোমবার সকাল ১০ ঘটিকা

ক্লাশ শুরুঃ ০৮ জানুয়ারি ২০২২

হিফজ বিভাগঃ
- ক্বারীআনা/নূরাণী ট্রেনিং
- নাজেরা
- হিফজ
- শুনানী

কিতাব বিভাগঃ
- ইবতেদাইয়্যাহ উলা (১ম শ্রেণি) থেকে ইবতেদাইয়্যাহ খামেছাহ (৫ম শ্রেণি/মিজান জামাত)।
- মুতাওয়াসিত্বাহ উলা/৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে মুতাওয়াসিত্বাহ খামেছাহ (দশম শ্রেণি/মিশকাত জামাত)। পর্যায়ক্রমে দাওরা হাদীস পর্যন্ত।

আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যঃ
- ইসলামী বিশুদ্ধ আক্বীদা,শিরক ও বিদআত মুক্তভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীছ ভিত্তিক পাঠদান।
- নিজস্ব জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বোচ্চ ক্যাডেট মানের সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত স্থায়ী ক্যাম্পাস।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকামন্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- হিফজ শেষ করে বয়স ও মেধা অনুযায়ী কিতাব বিভাগে ভর্তির সুযোগ।
- উন্নত আবাসিক পৃথক পৃথক ষ্টীল খাটে থাকা, পাঁচ বেলা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন।

উত্তম বানিয়া পাড়া, সিও বাজার, রংপুর মহানগর, রংপুর।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মশিউর রিন মাহতাব
মোবাঃ 01712-593683

দাড়ি সম্পর্কে ইসলামের বিধান

-সাজ্জাদ সালাদীন*

দাড়ি আল্লাহর একটি বড় নেয়ামত এবং ইসলামের চিহ্ন বলে বিবেচিত। দাড়ি মানেই পুরুষত্ব। এটি পুরুষত্বের পরিচয় ও সৌন্দর্যস্বরূপ মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ চাইলে পুরুষদের সৃষ্টি করতে পারতেন দাড়িবিহীন। কিন্তু তিনি দাড়ি দিয়ে পুরুষকে নারী থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই বেশি জানেন যে, পুরুষের জন্য কোনটি বেশি উপযোগী? তিনি পুরুষের জন্য দাড়ি পছন্দ করেছেন, তাই এর দ্বারা তাকে সজ্জিত করেছেন। আল্লাহ যা পছন্দ করেছেন, কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কি সেটাকে অপছন্দ করতে পারে? আল্লাহ বেশি জানেন, না-কি বান্দা বেশি জানে? কারণ, মানুষের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾ ‘তোমরা কি বেশি জানো, না আল্লাহ?’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৪০)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ‘যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূদক্ষদর্শী, সম্যক অবগত’ *(আল-মুলক, ৬৭/১৪)*।

দাড়ি মহান আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এর দ্বারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ‘এটাই আল্লাহর বিধান। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়ারই বহিঃপ্রকাশ’ *(আল-হজ্জ, ২২/৩২)*।

দাড়ির পরিচয় :

আরবী ভাষায় দাড়িকে বলা হয় (لِحْيَةٌ) লিহইয়াতুন। বহুবচন (لِحًى، لُحًى) এর আভিধানিক অর্থ হলো থুতনিসহ মুখের দুই পাশের ওই হাড়, যার ওপর দাঁতগুলো অবস্থিত। প্রাপ্তবয়সে ওই হাড়ের ওপর যে লোম বা কেশ গজায়, ওই লোম বা কেশগুলোকেই হাড়ের নামকরণে লিহইয়া বলা হয়।

ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল ক্বারীতে দাড়ির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, هي اسم لما نبت على الخدين والذقن ‘দুই গাল এবং থুতনিতে গজানো কেশকে দাড়ি বলে’।[১] ছহীহ মুসলিম গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল মুলহিমেও এমনটি বলা হয়েছে।[২]

দাড়ি রাখার গুরুত্ব :

আমাদের দেশে দাড়ি রাখা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে, সেটা হলো দাড়ি রাখা সুন্নাত। অতএব দাড়ি রাখলে ভালো আর না রাখলে তেমন কোনো সমস্যা নেই; একটি সুন্নাত পালন করা হলো না— এই আর কী। জেনে রাখুন, এটি সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা। দাড়ি রাখা কোন অর্থে সুন্নাত আর কোন অর্থে ফরয বা ওয়াজিব আগে সেটা বুঝার চেষ্টা করুন। ইসলামী শরীআতের প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর ছহীহ সুন্নাহ বা ছহীহ হাদীছ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে সকল বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ও নিষেধ করেছেন, তা পালন করা আমাদের জন্য ফরয। আল্লাহ তাআলা যেমন মুসলিমদের জন্য কোনোকিছু ফরয করেন, নবী ﷺ ও তেমনি ফরয বা ওয়াজিব করেন। তার কারণ হচ্ছে রাসূল ﷺ কখনো নিজের কল্পনাপ্রসূত কোনো কথা বলতেন না; আল্লাহ তাঁর নিকট যা অহী করতেন তিনি তাই বলতেন *(আন-নজম, ৫৩/৩-৪)*। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করতে আমাদের আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আমরা আপনাকে তাদের ওপর রক্ষক নিযুক্ত করিনি’ *(আন-নিসা, ৪/৮০)*।

নবী-রাসূলগণের দাড়ি ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ ‘(হারূন عليه السلام বলল,) হে আমার জননী-তনয় (মূসা), আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টানিয়ো না’ *(ত্বা-হা, ২০/৯৪)*। আমাদের নবী ﷺ দাড়ি রেখেছেন বলেই দাড়ি নবীজীর সুন্নাত বলে তার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কেননা রাসূল ﷺ শুধু নিজেই দাড়ি রাখেননি, বরং তা রাখার জন্যে সবাইকে নির্দেশও দিয়েছেন। তাছাড়া রাসূল ﷺ দাড়ির বিষয়ে যে সকল আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন তার বিপরীতে এমন কোনো হাদীছ খুঁজে পাওয়া যাবে না যা দ্বারা দাড়িকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা যাবে। এছাড়াও ইজমা-ক্বিয়াস দ্বারাও কোনোভাবেই দাড়ি রাখা ফরয নয়- এই কথা বলার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। বরং অধিকাংশ আলেমের দাড়ি রাখা ওয়াজিব।

ইবনু উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ‘মুশরিকদের বিরোধিতা করত মোচ খাটো করো এবং দাড়ি লম্বা করো’।[৩] আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

* এম. এ., ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১. উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৩২/৬৬।

২. ফাতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম, ১/৪২১।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৯; মিশকাত, হা/৪৪২১।

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ ‘তোমরা মোচ খাটো করো ও দাড়ি বাড়াও এবং অগ্নিপূজারিদের বিরোধিতা করো’।[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى ‘মোচ কাটো এবং দাড়ি লম্বা করো’।[৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন পুরুষদের উপর অভিশাপ করেন, যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে।[৬] আর দাড়িমুণ্ডন করা মহিলাদের বেশ ধারণ করার অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।

দাড়ির ব্যাপারে বিশ্ববরেণ্য আলেমগণের ফাতাওয়া :

উলামায়ে কেরাম হালাল-হারামের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন,﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ‘অতএব তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো’ *(আন-নাহল, ১৬/৪৩)*। আলেমদের ফাতাওয়া হলো, দাড়ি রাখা ফরয আর মুণ্ডন বা শেভ করা হারাম। ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহ (মৃত: ৪৫৬ হি.) বলেন, اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ‘সমস্ত আলেম একমত যে, মোচ কাটা এবং দাড়ি রাখা ফরয’।[৭] ইমাম ইবনু আবদিল বার রাহিমাহুল্লাহ (মৃত: ৪৬৩ হি.) তাঁর তামহীদ কিতাবে বলেন, يَحْرُم حَلق اللِّحية ولا يَفعله إلا المُخنَّثون منَ الرجال يعني بذلك المتشبِّهين بالنِّساء ‘দাড়িমুণ্ডানো হারাম। আর এ কাজটি পুরুষের মধ্যে মুখান্নাছ বা নারীর বেশ ধারণকারীরাই করে থাকে’।[৮]

সুধী পাঠক! উপরে উল্লেখিত দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে জানতে পারা যায় যে, দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব এবং মুণ্ডানো বা শেভ করা হারাম। দাড়ি মুণ্ডানো বা শেভ করলে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা হয়, যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলাকে মানবের সেরা শত্রু দুষ্ট ইবলীস শয়তান বলল,﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ ‘আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দিব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে’ *(আন-নিসা, ৪/১১৯)*।

রাসূল ﷺ -এর দাড়ির আকৃতি কেমন ছিল :

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাড়ি লম্বা ছিল; ছাহাবীগণের দাড়িও লম্বা ছিল। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ -এর বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, ‘তিনি অনেক বড় দাড়ির অধিকারী ছিলেন’।[৯] জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূল ﷺ -এর দাড়ি ছিল বেশি ঘন।[১০]

দাড়ির প্রতি অবজ্ঞাকারীদের ঈমান নবায়ন করতে হবে, ইসলামের কোনো নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা-মজাক করা বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো সুন্নাতকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা কুফরী কাজ, যা দ্বারা মানুষ ঈমান হতে খারিজ হয়ে যায় *(তাত-তওবা, ৯/৬৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে’।[১১] হাদীছটিকে শায়খ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ ছহীহ বলেছেন।[১২]

যারা অমুসলিমদের বেশভূষা বা চালচলন, চুল বা দাড়ির কাটছাঁট পছন্দ করে, তারা এটা বিজাতীদের ভালোবেসেই করে। যদি এমনটি হয়, তাহলে তারা নিশ্চয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঈমানদারদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ‘তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন’ *(আল-মায়েদা, ৫/৫১)*। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ এ ব্যাপারে বলেন, দাড়িমুণ্ডন বা দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হতে কিছু কেটে নেওয়া বৈধ নয়। এটা রাসূল ﷺ -এর সুন্নাত বিরোধী কাজ।[১৩]

চুলে ও দাড়িতে রং করার বিধান :

চুল বা দাড়িতে কালো রং লাগানো একটি হারাম কাজ ও কবীরা গোনাহ। কিন্তু সাদা চুল-দাড়ি মেহদি বা অন্য রং দিয়ে পরিবর্তন করা নবী ﷺ এর সুন্নাত। তিনি সাদা চুলকে কালো রং বাদ দিয়ে অন্য রং দিয়ে পরিবর্তন করতে আদেশ দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন,إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ‘ইয়াহূদী ও নাসারারা চুল ও দাড়িতে খেযাব লাগায় না। সুতরাং তোমরা খেযাব লাগিয়ে তাদের বিপরীত করো’।[১৪] কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে লোকেরা এ আদেশ অমান্য করে কালো রং দিয়ে খেযাব (কলপ) লাগাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ﷺ বলেন,

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২৯ নং পৃষ্ঠায়)

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৯৩।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৮৮৬।
৭. মাজমূআ ফাতাওয়া ইবনু বায, ‘দাড়ি রাখার বিধান’ পরিচ্ছদ, ৩/৩৬২।
৮. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ‘দাড়িমুণ্ডানোর বিধান’ পরিচ্ছদ, ৫/১৩৫।
৯. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৬৩১১; মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৪৬।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/৬২৩০; মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হা/৭৪৫৬।
১১. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাদীছটি হাসান ছহীহ; সিলসিলা ছহীহা, ১/৩৯০।
১২. হিযাবুল মারআ আল-মুসলিমা, পৃ. ১০৪।
১৩. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ৫/১৩৭।
১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬২।

www.al-itisam.com

থার্টিফার্স্ট নাইট : বর্ষবরণের নামে অশ্লীলতা

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

মুসলিম জীবনের আনন্দ-উৎসব আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও অশ্লীলতায় নিহিত নয়; বরং তা নিহিত আছে আল্লাহর দেওয়া আদেশ পালন করতে পারার মাঝে।* কেননা মুসলিমের ভোগ-বিলাসের স্থান ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী নয়; বরং চিরস্থায়ী জান্নাত। তাই মুসলিম জীবনের প্রতিটি কাজে জড়িয়ে থাকবে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাদের ঈমান, আখেরাতের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা। ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের দিবাগত রাতকে থার্টিফার্স্ট নাইট বলা হয়। বর্ষবরণের নামে এ রাতকে ঘিরে পশ্চিমাদের যে কত আয়োজন, তার কোনো শেষ নেই। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো আজ মুসলিমরাও এ আয়োজনে পিছিয়ে নেই। আতশবাজি, পটকাবাজি, নাচ-গান, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, মাদক সেবন, নারীর শ্লীলতাহানি, যেনা-ব্যভিচারসহ কত কিছুই না হচ্ছে এ রাতে। এ সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ আমাদের মধ্যে নিম্নোক্ত হাদীছের বাস্তব প্রতিফলন পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ فَمَنْ؟

আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের আগের উম্মতদের পদে পদে অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢুকে থাকে, তোমরাও তাতে ঢুকবে’। আমরা আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আগের উম্মত বলতে কি ইয়াহূদ ও নাছারা বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন, ‘তবে আর কারা?’[১]

অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান যদি দুর্গন্ধযুক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে সংকীর্ণ গর্তে প্রবেশ করে, তবে মুসলিমও কেবল তাদের অনুকরণার্থে সেই গর্তে প্রবেশ করবে। মোটকথা, প্রতিটি কদমে কদমে তাদের অনুসরণ করা হবে। তা যত নিকৃষ্ট কাজই হোক না কেন। অথচ একটি হাদীছে এসেছে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে’।[২]

ইংরেজি সনের বর্তমান রূপ :

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকার মেক্সিকোতে একটি সভ্যতা ছিল, যার নাম ‘মায়া সভ্যতা’। সংখ্যাতাত্ত্বিক জ্ঞান ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে ‘মায়া’দের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তারাই প্রথম আবিষ্কার করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন। বলা হয়ে থাকে, নিজেদের গণনার সুবিধার্থে সর্বপ্রথম রোমানরা ক্যালেন্ডার তৈরি করে। তাতে বছরের প্রথম মাস ছিল মারটিয়াস, যা বর্তমানে মার্চ মাস। এটি তাদের যুদ্ধ দেবতার নামানুসারে করা হয়। অতঃপর খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতকে জুলিয়াস সিজার কয়েক দফা পরিবর্তন ঘটান ক্যালেন্ডারে। তৎকালীন প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনিই প্রথম সেখানে (‘মায়া’দের আবিষ্কৃত সূর্যকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকাল) ৩৬৫ দিন ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার উদ্ভাবিত ‘জুলিয়ান ক্যালেন্ডার’ বাজারে প্রচলিত থাকে। বহুকাল পরে এই ক্যালেন্ডার সংশোধন করে নতুন একটি ক্যালেন্ডার চালু হয়। দু’জন জোতির্বিজ্ঞানীর সাহায্যে খ্রিষ্টধর্মের ত্রয়োদশ পোপ গ্রেগরী ১৫৭৭ সালে জুলিয়াস প্রবর্তিত প্রচলিত ক্যালেন্ডারটিতে পরিবর্তন আনেন। অবশেষে ১৫৮২ সালে আরেক দফা সংস্কার করে বর্তমান কাঠামোতে দাঁড় করানো হয়। পরিবর্তিত এ ক্যালেন্ডারে নতুন বর্ষের শুরু হয় জানুয়ারি দিয়ে, যা গ্রিকদের আত্মরক্ষার দেবতা ‘জানুস’-এর নামে করা হয়। আমাদের ব্যবহৃত বর্তমান ইংরেজি ক্যালেন্ডারটি ‘গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার’। প্রায় সারা বিশ্বে প্রচলিত ইংরেজি ক্যালেন্ডার এখন এটিই।[৩]

এই রাতে যা যা করা হয় :

এই রাতে যা যা করা হয়, প্রত্যেকটিই অত্যন্ত জঘন্য গুনাহ। যেমন :

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৬।

২. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাদীছ হাসান ছহীহ; মিশকাত, হা/৪৩৪৭।

৩. শরীফা খাতুন, বর্ষবরণ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০১৭), পৃ. ৬।

www.al-itisam.com

(১) আতশবাজি, পটকাবাজি, আলোকসজ্জা ইত্যাদি। এগুলো একদিক থেকে যেমন মুশরিকদের কাজ, তেমনিভাবে অন্য ভাইদের জন্য কষ্টের কারণও বটে। এর দ্বারা অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষ করে বৃদ্ধ, অসুস্থ ও বাচ্চাদের অনেক কষ্ট হয়, যা স্পষ্ট হারাম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘প্রকৃত মুসলিম সে ব্যক্তি, যার জিহ্বা এবং হাত হতে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকেন। প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ত্যাগ করেন’।[৪] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম একদা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! ইসলামের কোন কাজটি সর্বাপেক্ষা উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, ‘যার হাত ও জিহ্বা হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে’।[৫]

(২) এই রাতে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়, যা আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ‘আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং আগের অজ্ঞতার যুগের ন্যায় নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না; তোমরা ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন করবে। হে নবীর পরিবার! আল্লাহ তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখতে চান’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)*।

(৩) এই রাতে ব্যাপক আকারে নাচ-গান ও বাদ্য বাজানো হয়। এক তো এগুলো এমনিতেই নাজায়েয উপরন্তু দ্বীনদার লোককে শুনতে বাধ্য করা হয় এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়া হয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

আবূ মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘অবশ্যই অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে’।[৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوْهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ.

আবূ উমামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা গায়িকা নর্তকীদের বিক্রয় করো না, তাদের ক্রয় করো না, তাদের গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র শিখিয়ে দিয়ো না, তাদের উপার্জন হারাম’।[৭] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ.

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘এই উম্মতের মাঝে ভূমিধ্বস, আকৃতি পরিবর্তন এবং শীলাবৃষ্টি হবে’। কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! তা কখন হবে? তিনি বললেন, ‘যখন এই উম্মতের মাঝে গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র এবং মদপান দেখা দিবে’।[৮]

রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গান-বাজনার কোনো আওয়াজ পেলে কানে হাত দিয়ে সে পথ অতিক্রম করতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنْ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

নাফে‘ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেলে তিনি তাঁর দুই কানে দুই আঙুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গেলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, নাফে‘ তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। তিনি তার দুই আঙুল দুই কান হতে বের করে বললেন, আমি একদা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১০; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৭৬৫।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/১১।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০।
৭. তিরমিযী, হা/১২৮২; ইবনু মাজাহ, হা/২১৬৮; মিশকাত, হা/২৭৮০, হাদীছ হাসান।
৮. তিরমিযী, হা/২২১২, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেভাবে আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।[৯]

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘গান-বাদ্যে লিপ্ত ব্যক্তি হলো আহাম্মক’। তিনি আরও বলেন, ‘সর্বপ্রকার বীণা, তন্ত্রী, ঢাকঢোল, তবলা, সারেঙ্গী সবই হারাম এবং এর শ্রোতা ফাসেক্ব। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না’।[১০] ইমাম ইবনু তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যার স্বভাব হলো গান-বাজনা শোনা, সে যখন কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করে, তখন সে আবেগাপ্লুত হয় না, অপরদিকে সে যখন শয়তানের বাদ্যযন্ত্র (গান-বাজনা) শ্রবণ করে, সে নেচে উঠে। যদি সে ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, তবে সে হয় বসে বসে তা আদায় করে অথবা মুরগি যেভাবে মাটিতে ঠোকর দিয়ে শস্যদানা খায় সেভাবে দ্রুততার সাথে আদায় করে। সে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করতে অপছন্দ করে এবং তাতে কোনো সৌন্দর্য খুঁজে পায় না। কুরআনের প্রতি তার কোনো রুচি নেই এবং যখন তা পড়া হয়, সে এর প্রতি কোনো টান বা ভালোবাসা অনুভব করে না; বরং সে মু‘কা (শিষ দেওয়া) ও তাছদিয়া (তালি দেওয়া) শুনে মজা পায়। এগুলো শয়তানী আনন্দ এবং সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য একটি শয়তান নিযুক্ত করে দেই। অতঃপর সে সর্বক্ষণ তার সাথী হয়ে থাকে’।[১১] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহর শত্রু শয়তানের কৌশলসমূহের মধ্যে একটি হলো মু‘কা ও তাছদিয়া। এই ফাঁদ সে ঐ সকল লোকের জন্য পাতে, যারা দ্বীনের প্রতি বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান অথবা আন্তরিকতায় নিরাসক্ত। এই গাফেল (মূর্খ) লোকেরা গান-বাজনা শ্রবণ করে এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে, যা নিষিদ্ধ এবং যার ফলে কুরআনের প্রতি তাদের অন্তর বিমুখ হয়ে যায়। তাদের হৃদয় পাপাচারের প্রতি উদাসীন ও আল্লাহর অবাধ্য। গান-বাজনা (সঙ্গীত) শয়তানের কুরআন এবং ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝের দেয়াল। এটা সমকামিতা ও ব্যভিচারের পথ। যে অন্যায় ভালোবাসার সন্ধান করে ও স্বপ্ন দেখে, সে এতে সান্ত্বনা খুঁজে পায়। গান-বাজনার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে ও একে তাদের চোখে শিল্প হিসাবে দেখিয়ে শয়তান দুর্বলচিত্তের মানুষদের ফাঁদে ফেলে। শয়তান তার অনুসারীদের সঙ্গীতের সৌন্দর্যের মিথ্যা দলীল দেখায়। এই লোকগুলো শয়তানের অহী গ্রহণ করে এবং ফলস্বরূপ কুরআন ত্যাগ করে’।[১২]

(৪) এই রাতে মদপানসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করা হয়, যা স্পষ্ট হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও ছালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা বিরত থাকবে না?’ *(আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১)*। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি ইয়ামানের জায়শান হতে আগমন করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে তাদের ভূমিতে উৎপন্ন যুরাহ (ভুট্টা) থেকে প্রস্তুতকৃত শারাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যাকে মিযরু বলা হয়ে থাকে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তা কি মাতাল করে (নেশা সৃষ্টিকারী?) সে ব্যক্তি বললেন, জি, হ্যাঁ। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সকল প্রকার মাতালকারী বস্তু হারাম। আর আল্লাহ এ অঙ্গীকার করেছেন যে, যে ব্যক্তি মাতালকারী বস্তু পান করবে তিনি তাকে ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ ভক্ষণ করাবেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! ‘ত্বীনাতুল খবাল’ কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট রস।[১৩]

মদপানকারীর ৪০ দিনের ছালাত কবুল করা হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি শারাব (মদ) পান করে এবং মাতাল হয়, ৪০ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল হয় না। সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন। সে পুনরায় শারাব পানে লিপ্ত হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ

৯. আবূ দাঊদ, হা/৪৯২৪, হাদীছ ছহীহ।
১০. ইগাছাতুল লাহফান, ১/১৭৯; কুরতুবী, ১৪/৫৫।
১১. আউলিয়া আর-রহমান, পৃ. ৩৬।
১২. ইগাছাতুল লাহফান, পৃ. ৪০০-৪০১।
১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২০০২।

www.al-itisam.com

তাআলা অবশ্যই তাকে ‘রাদগাতুল খাবাল’ পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ‘রাদগাতুল খাবাল’ কী? তিনি বলেন, জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ ও রক্ত।[১৪]

(৫) এই রাতে অনেক যুবক-যুবতী যেনা-ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ‘আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ’ *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*। ব্যভিচারের অপরাধের জঘন্যতার কারণে বলা হয়েছে, ব্যভিচারকালে ব্যক্তির ঈমান থাকে না। রাসূল ﷺ বলেন, ‘কোনো ব্যভিচারী ব্যভিচারের সময়ে মুমিন অবস্থায় থাকে না। কোনো চোর চুরির সময় মুমিন অবস্থায় থাকে না। কোনো মদখোর মদ খাওয়ার সময় মুমিন অবস্থায় থাকে না’।[১৫] রাসূল ﷺ আরও বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি যখন ব্যভিচার করে, তখন তার ভেতর থেকে ঈমান বেরিয়ে যায়, এরপর তা তার মাথার উপর ছায়ার মতো অবস্থান করতে থাকে। এরপর সে যখন তা থেকে তওবা করে, তখন তার ঈমান পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে’।[১৬]

যেনা বা ব্যভিচার সাতটি জিনিস দিয়ে হয়। যথা :

(ক) মন : এখান থেকেই ব্যভিচারের উৎপত্তি। যে ব্যক্তি মনের বিরুদ্ধে চলতে পারে, সেই পূর্ণ ঈমানদার মুসলিম হয়।

(খ) চোখ : চোখের ব্যভিচার সবচেয়ে বড় ব্যভিচার। কারোর প্রতি অসাবধানতাবশত ১ম বার চোখ পড়লে পাপ হয় না। কিন্তু ২য় বার তাকালে বা ১ম বার দৃষ্টির পর সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে না নিলে যেনা তথা ব্যভিচার হয়।

(গ) জিহ্বা : জিহ্বা দ্বারা ব্যভিচার হয় যখন একজন নর বা নারী আরেকজন নন-মাহরাম নর বা নারীর সাথে কথা বলে।

(ঘ) কান : এটা দিয়ে ব্যভিচার হয় যখন নর বা নারীর পরস্পরের কথা সেই অর্থে শোনা হয়।

(ঙ) হাত : এটা দিয়ে ব্যভিচার হয় যখন কোনো বিবাহিত বা অবিবাহিত নর বা নারীর শরীরের যেকোনো অংশ স্পর্শ বা ধরা হয়।

(চ) পা : এটা দিয়ে ব্যভিচার হয় যখন পায়ে হেঁটে কাঙ্ক্ষিত কোনো নর বা নারীর কাছে যাওয়া হয়।

(ছ) গুপ্তাঙ্গ : এটা দিয়েই শুধু ব্যভিচার হয় মানুষ তা ভাবলেও এটার স্থান সবার পরে। কেননা উপরে ছয়টিকে দমন করতে পারলেই এই অঙ্গ হেফাযত করা যাবে।

(৬) এই রাতে মেয়েরা বিভিন্ন অশালীন ও অশ্লীল কাপড়চোপড় পরিধান করে, যার কারণে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতেই থাকে। যুবতীরা আঁটোসাঁটো, অশালীন ও নগ্ন পোশাক পরিধান করে অবাধে চলাফেরা করে। অথচ এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, ‘ওইসব নারী যারা হবে পোশাক পরিহিতা কিন্তু নগ্ন, যারা পরপুরুষকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হবে, তাদের মাথা বক্র উচুঁ কাঁধবিশিষ্ট উটের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না’।[১৭]

(৭) অর্থ অপচয় করা হয়। এই রাতকে কেন্দ্র করে অনেক অর্থ অনৈসলামিক ও হারাম কাজে ব্যয় করা হয়, যা অপচয় ও অপব্যয়ের শামিল। আর ইসলাম অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ ‘আত্মীয়স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ’ *(বানী ইসরাঈল, ১৭/২৬-২৭)*।

(৮) দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকার কারণে ফজরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুমিনদের জীবন তো হবে মুহাসাবার (কৃতকর্মের হিসাব গ্রহণের) জীবন। একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হিসাবের তাড়না তাকে বিচলিত করে রাখবে। হায়! আমার মূল্যবান জীবন থেকে একটি বছর চলে গেল। আমি তো আল্লাহ তাআলার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। আখেরাতের তেমন কোনো পুঁজি জোগাড় করতে পারলাম না। তা না করে জঘন্যতম গোনাহসমূহের দ্বারা আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হওয়া কোনো মুমিনের কাজ হতে পারে না। এর কোনো নযীর না রাসূল ﷺ থেকে রয়েছে, না ছাহাবীদের থেকে, না স্বর্ণযুগের অন্য কারো থেকে পাওয়া যায়; বরং এ ধরনের গুনাহের কর্মকাণ্ড দ্বারা আনন্দ উদযাপনের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।

১৪. ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৭৭, হাদীছ ছহীহ।

১৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৪৭৫।

১৬. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯০; তিরমিযী, হা/২৬২৫, হাদীছ ছহীহ।

১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৮।

www.al-itisam.com

জীবনের মূল্য

[৫ মুহাররম, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ১৩ আগস্ট, ২০২১। মদীনা মসজিদে নববীতে জুমআর খুৎবা প্রদান করেন শায়খ ড. আব্দুল আযীয আত-তুওয়াইজিরী হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর সম্মানিত গবেষণা সহকারী মো. তরিকুল ইসলাম। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, যিনি অভিভাবক ও প্রশংসিত। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং যা ইচ্ছা তা হুকুম করেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বূদ নেই, যিনি আরশের অধিপতি ও সম্মানিত। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। ছালাত, সালাম ও বরকত নাযিল হোক মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর ছাহাবীগণ, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপর। অতঃপর, শায়েখ মুছল্লীদের লক্ষ্য করে কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো। তোমরা যা কর, নিশ্চয় মহান আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত' *(আল-হাশর, ৫৯/১৮)*।

নিশ্চয় আমরা অতিক্রান্ত দিনগুলো নিয়ে আনন্দ করি, অথচ অতিবাহিত প্রতিটি দিন আমাদের মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ের নিকটবর্তী করে দিচ্ছে। মৃত্যুর আগেই নিজের কল্যাণের জন্য পরিশ্রমী হয়ে আমল করো। কারণ লাভ ও ক্ষতি তো নির্ভর করছে আমলের ওপরই। বছর দ্রুত চলে যাচ্ছে। আর মৃত্যু অনেক প্রিয়জন, সঙ্গী ও বান্দাদের কেড়ে নিচ্ছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সৎ লোকেরা একের পর এক [ক্রমান্বয়ে] মৃত্যুবরণ করবে। আর অবশিষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট মানের যব অথবা খেজুরের মতো পড়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা এদের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবেন না'।[১] নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করার সময় বলতেন, وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ 'প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের জন্য আমার হায়াতকে [আয়ুষ্কাল] বাড়িয়ে দিন, আর আমার মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অকল্যাণ হতে শান্তিস্বরূপ করুন'।[২]

দুনিয়াতে অনেক স্তর বা ধাপ বিদ্যমান। মানুষ একটির পর একটি ধাপ পার করে তার জীবন অতিবাহিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ 'আল্লাহ, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বলতা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম' *(আর-রূম, ৩০/৫৪)*।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে'।[৩] মানুষের মধ্যে এমন কতক মানুষ আছে, প্রতি বছর তাদের ঈমান বৃদ্ধি হয়, তাদের দ্বীনের উপর আরো দৃঢ়তা বাড়ে, আখলাক বা চরিত্রে উন্নতি হয় এবং তাদের প্রচেষ্টা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে কতক মানুষ আছে, যারা কুপ্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পেছনে তাদের যৌবনসহ মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করে। তারা পানি ছাড়াই সাতার কাটে এবং ডানা ছাড়াই আকাশে উড়ে। প্রতিটি বছর তাদের মানহাজে দোদুল্যমানতা বাড়ে এবং ঈমানের দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি হয়। প্রথম ঝড়েই তাদের পা পিছলে যায়। প্রথম পরীক্ষাতেই তারা হোঁচট খায়। যেকোনো

১. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৩৪।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২০।
৩. তিরমিযী, হা/২৩৩০।

সংশয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের কোনো ইয়াক্বীন বা দৃঢ়বিশ্বাস নেই, যেটি তাদেরকে দৃঢ় রাখবে। তাদের কোনো জ্ঞানও নেই যেটি তাদেরকে হেদায়াত করবে। নবী ﷺ বলেছেন,كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا 'প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজেকে বিক্রয় করে, এতে সে হয় নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে'।[৪] সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ এবং পরিবর্তনের কারণে মানুষের পদস্খলন ঘটছে, যাতে ধৈর্যশীলগণও হয়রান বা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে ঈমান সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন বিচক্ষণতা, সৎ আমল করা এবং উপকারী জ্ঞানার্জন করা।

উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا 'তোমরা নেতা হওয়ার আগেই জ্ঞানার্জন করে নাও'। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, নবী ﷺ-এর ছাহাবীগণ বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞানার্জন করেছেন। অতএব দুর্ভোগ তাদের, যারা নিজেদের মূল্যবান জীবনকে উপকারবিহীন অনর্থক কাজে নষ্ট করে।[৫] ইমাম ত্বাবারানী তার 'আল-মু'জামুল কাবীর' কিতাবে ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, 'আমি এমন ব্যক্তিকে দেখে রাগান্বিত হই, যে ব্যক্তি দুনিয়ারও কোনো কাজ করে না আবার আখেরাতেরও কোনো কাজ করে না; বরং বেকার বসে থাকে'।[৬] ইবনু ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ-এর জীবনীতে আছে, তিনি বলেছেন যে, 'বেকার ব্যক্তিরা কখনো বিচক্ষণ বা জ্ঞানী হতে পারে না'।[৭]

তুচ্ছ মূল্যে মূল্যবান সামগ্রীর আশা করো না। মিথ্যা কথায় সম্মান বা মর্যাদা কেনা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো অবস্থা আসেনি। অর্থসংকট ও দুঃখক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে'? জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে' *(আল-বাক্বারা, ২/২১৪)*।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া চলা মানেই হলো জীবনকে নষ্ট করা। নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পরে আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু দুই বছর আর কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন। তিনি এই সময়ে যেসব কাজ সম্পাদন করেছিলেন, সেগুলো কয়েক শতাব্দী ধরে অনেকগুলো রাষ্ট্রও করতে সক্ষম নয়। তিনি মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, আরব উপদ্বীপকে আবার ইসলামের ছায়ায় ফিরিয়ে এনেছিলেন, পারস্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন, রোমকে অবরুদ্ধ করেছিলেন, কুরআন সংকলন করেছিলেন এবং ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। এ সমস্ত কাজ তিনি করেছিলেন মাত্র ৩০ মাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'মুমিন পুরুষ হোক বা নারী হোক যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব' *(আন-নাহল, ১৬/৯৭)*।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আমি আনছারদের এক যুবককে বললাম, হে অমুক! চলুন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছাহাবীগণের নিকট (হাদীছ সম্পর্কে) প্রশ্ন করি। তখন তিনি বললেন, হে ইবনু আব্বাস! তুমি কী আশ্চর্যজনক কথা বলছ! তুমি কি মনে কর, লোকেরা তোমার মুখাপেক্ষী হবে? যেখানে লোকদের মাঝে এখনো নবী করীম ﷺ-এর অনেক ছাহাবী বিদ্যমান রয়েছেন, যাদেরকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। এ কথা বলে তিনি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে চললাম। আমি যায়েদ ইবনু ছাবেতের সান্নিধ্যে থাকতে লাগলাম। প্রতিদিন সকালে আমি তার কাছে আসতাম। আর সেই যুবকটি থেকেই গেল। এমনকি সে দেখল যে, লোকজন আমার কাছে জড়ো হচ্ছে। তখন সে বলল, এই যুবকটি আমার থেকেও বেশি জ্ঞানী।[৮]

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে কুরআনুল কারীম ও সাইয়্যেদুল মুরসালীন নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাহ দিয়ে উপকৃত করুন। আমি আমার জন্য, আপনাদের ও সকল মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই। আপনারাও তাঁরই কাছে ক্ষমা চান এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসুন। নিশ্চয় আপনাদের রব মহাক্ষমাশীল, পরম কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় খুৎবা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের রব। ছালাত ও সালাম নাযিল হোক সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবা ও তাদের অনুসরণকারীদের উপর। মুসলিম ব্যক্তি তার আমল সর্বোচ্চ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হয় না। যদি সে কিছু চায়, তবে শ্রেষ্ঠ জিনিসটিই চায়। যদি সে সেটি নাও চায়, তবে কমপক্ষে এটি চায়, যেন তার ছেলে-মেয়েরা কল্যাণকর

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩।
৫. ছহীহ বুখারী, ১/২৫।
৬. মু'জামুল কাবীর, ৯/১০৩।
৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/৩০।
৮. দারেমী, হা/৫৯০।

কাজে আদর্শ হয়। আল্লাহ বলেন, ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ ‘আর আপনি আমাদের মুত্তাক্বীদের জন্য অনুসরণযোগ্য করুন’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭৪)*। নবী করীম ﷺ তার উম্মতকে সর্বোত্তম জিনিস চাইতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ‘তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত’। (রাবী বলেন) আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাও বলেছেন, ‘এর উপরে রয়েছে রহমানের আরশ। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়’।[৯]

যখন আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষের জীবনে বরকত দান করেন, তখন সে নিজেও উপকৃত হয় এবং তার পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য মানুষজনও উপকৃত হয়। মানুষজন ইবনু বায রহিমাহুল্লাহ-এর জীবন দেখে আশ্চর্য হয়। তিনি অন্যদের শিক্ষা দিতেন, ফতওয়া দিতেন, বিচার করতেন, বক্তৃতা দিতেন এবং বিভিন্ন কাজের ও মন্ত্রণালয়ে নেতৃত্বও দিতেন। এগুলো করার সাথে সাথে তিনি রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতেন এবং কুরআন তেলাওয়াতও করতেন। এক বছর, দুই বছর, এমনকি দশ বছর পার হয়ে গেলেও আমাদের মধ্যে কারো যদি ইবাদতে, জ্ঞানার্জনে, আল্লাহর কিতাব মুখস্থকরণে, দ্বীনের বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনে এবং অন্যের উপকার করাতে কোনো উন্নতি না হয়, তখনই জীবনের বরকতের কমতি প্রকাশ পায়।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৯০।

সৎকর্মসমূহকে গনীমত মনে করে তা বেশি বেশি সম্পাদন করুন, যাতে আপনাদের নেকীর পরিমাণ বেড়ে যায়। নবী করীম ﷺ বলেছেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ اللهُ به السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ‘আশূরার দিনের ছিয়ামের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সেই ছিয়াম পালনকারীর আগের বছরের গুণাহের কাফফারা করে দেন’।[১০] আনছারগণ তাদের শিশুদেরকেও আশূরার ছিয়াম পালন করাতেন। আর তারা তাদের শিশুদেরকে পশমের খেলনা তৈরি করে দিতেন। সেই শিশুদের কেউ খাবারের জন্য কান্না করলে তারা (আনছারগণ) ঐ খেলনা দিয়ে তাদেরকে (শিশুদেরকে) ভুলিয়ে রাখতেন। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।[১১] আশূরার দিনের সাথে নয় তারিখেও ছিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। নবী করীম ﷺ বলেছেন,لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ‘ইনশাআল্লাহ আগামী বছর যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে ৯ তারিখেও ছিয়াম পালন করব’।[১২]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ইলম, আমল, রিযিক্ব ও তাওফীক্ব আরও বাড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবন ও আমলসমূহে বরকত দান করুন এবং আমাদের রিযিক্ব ও সন্তানসন্ততিতেও বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাহ ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর ছালাত ও সালাম নাযিল করুন- আমীন!

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬০।
১২. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪।

‘দাড়ি সম্পর্কে ইসলামের বিধান’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

‘শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আর্বিভাব হবে, যারা কবুতরের গলায় থলের ন্যায় কালো রঙের খেযাব লাগাবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪২১২, হাদীছ ছহীহ)*। কারোর মাথার চুল বা দাড়ি সাদা হয়ে গেলে তাতে কালো ছাড়া যে কোনো রং লাগানো সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ‘মক্কা বিজয়ের দিন (আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর পিতা) আবূ কুহাফাহকে (রাসূল ﷺ-এর সামনে) উপস্থিত করা হলো। তখন তার মাথায় চুল ও দাড়ি সাদা ফল ও ফুলবিশিষ্ট গাছের ন্যায় দেখাচ্ছিল। তা দেখে রাসূল ﷺ ছাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কোনোকিছু দিয়ে এই রং পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং কিন্তু লাগাবে না’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪২০৪, হাদীছ ছহীহ; নাসাঈ, হা/৫০৭৬)*।

রাসূল ﷺ সাধারণত মেহেদি, যাফরান ও ওয়ারস দিয়ে কালার করতেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত,أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ‘নবী ﷺ পাকা চামড়ার তৈরি জুতা পরতেন এবং তাঁর দাড়িতে ওয়ারসের রস ও যাফরান লাগাতেন’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪২১০, হাদীছ ছহীহ)*। রাসূল ﷺ আরও বলেন, إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ‘নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যা দিয়ে বার্ধক্যের সাদা বর্ণকে পরিবর্তন করা যায়, তা হচ্ছে মেহেদি ও কাতাম, যার ফল মরিচের ন্যায়’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪২০৫, হাদীছ ছহীহ)*। রাসূল ﷺ বলেন, كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ‘আমার উম্মতের সবাইকে আল্লাহর রহমতে মাফ করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা গোনাহ ও নাফরমানীকে সকলের কাছে প্রকাশ করে বেড়ায়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৬০৬৯)*।

পরিশেষে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করার প্রতিজ্ঞা করেই আমরা ইসলামে প্রবেশ করেছি। অতএব, মহান আল্লাহ ও তাঁর নবী ﷺ যেন দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় হয় এই চেষ্টাই করা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

মুমিনের কর্ম ও গুণাবলি

-নাজমুল হাসান সাকিব*

পবিত্র কুরআনের আটটি আয়াতে মুমিনের গুণাবলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।* এই গুণাবলির তৃতীয়টি হলো, ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ 'তারা ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে দেয়' *(আশ-শূরা, ৪২/৩৭)*। এটি সচ্চরিত্রের উত্তম নমুনা। কারো প্রতি ভালোবাসা অথবা ক্রোধের মাত্রা যখন তীব্র হয়, তখন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষও অন্ধ হয়ে যায়। বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও সে হারিয়ে ফেলে। কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হলে সাধ্যমতো শক্তি প্রয়োগ করে হলেও মনের ক্ষোভ মিটায় সে। অথচ মুমিনের গুণাবলির বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, ক্রোধের সময় তারা কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং রাগ বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা মাফ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ: কোনো এক এলাকার সাধারণ জনগণ একই এলাকার নেতৃস্থানীয় কাউকে গালমন্দ করল। এতে সে ভীষণ কষ্ট পেল এবং চরম রাগান্বিত হলো। এলাকার নেতা হওয়ার কারণে রাগ বাস্তবায়ন করার ক্ষমতাও তার আছে। কিন্তু লোকটির শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ তাআলার বাণী অনুযায়ী এই লোকটিই প্রকৃত মুমিন। যদিও সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়া জায়েয, যা মুমিনের সপ্তম গুণ।

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ 'আর (ওগুলো তাদের জন্য) যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে' *(আশ-শূরা, ৪২/৩৯)*। অর্থাৎ তারা অত্যাচারিত হলে সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালঙ্ঘন করে না। ঠিক ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যতটুকু অত্যাচারিত হয়; কিন্তু ক্ষমা করে না। আবার বেশিও করে না তথা সীমালঙ্ঘনও করে না। এটি তাদের তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা। তারা শত্রুকে ক্ষমা করে, তবে এমন কিছু পরিস্থিতি থাকে, যখন ক্ষমা করলে শত্রুর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করাই উত্তম বিবেচিত হয়। এরই বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ 'মন্দের প্রতিদান অনুরূপ মন্দ দিয়ে হয়ে থাকে' *(আশ-শূরা, ৪২/৪০)*। তোমরা আর্থিক অথবা শারীরিকভাবে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হও, ঠিক ততটুকু ক্ষতিরই সম্মুখীন তাদেরকে করো। তবে শর্ত হলো, তোমার মন্দ কাজটা যেন পাপে পরিণত না হয়। উদাহরণস্বরূপ: তোমাকে কেউ জোরপূর্বক মদ পান করিয়ে দিল, এখন তাকে মদ পান করিয়ে দেওয়া তোমার জন্য জায়েয হবে না। শরীআত যদিও সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু এ কথাও বলা হয়েছে যে,﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ 'যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধন করে নেয়, তার (উপযুক্ত) বিনিময় আল্লাহর নিকট আছে' *(আশ-শূরা, ৪২/৪০)*। এখানে মাফ করাই উত্তম বলে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী দুই আয়াতে এরই আরো বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইবরাহীম নাখাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ পাপাচার লোককর্তৃক মুমিনদের হেয়প্রতিপন্ন হওয়াকে পছন্দ করতেন না। তবে প্রতিশোধ না নিলে যদি তাদের ধৃষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, সে ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। আর ক্ষমা করা উত্তম তখন, যখন অত্যাচারী অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচারের কোন আশঙ্কা সৃষ্টি হয় না। কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী এবং কুরতুবী রাহিমাহুমাল্লাহ -এর নিকট এটিই পছন্দনীয় অভিমত। তারা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দুটিই অবস্থাভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম। আর যে ব্যক্তি তরি জিদ ধরে রাখে এবং অত্যাচারের উপর অটল থাকে, তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া উত্তম। বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে খাঁটি মুমিনের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।

﴿هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ তারা ক্ষমা করে দেয় তথা তারা ক্রোধের সময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন না, বরং তখনো ক্ষমা ও অনুকম্পার মাত্রা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে তারা ক্ষমা প্রদর্শন করে।

﴿هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তথা অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মনে জাগ্রত হলেও তারা এক্ষেত্রে ন্যায়কে সীমালঙ্ঘন করে না; যদিও ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম।

---

* শিক্ষার্থী, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা ১২২৯।

বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে জলবায়ু সম্মেলনের কি আদৌ কোনো ভূমিকা আছে?

-জুয়েল রানা*

ভূমিকা : স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে গত ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৬)। যা ১২ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত চলছিল। প্যারিস চুক্তি পরবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সম্মেলন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন।

জলবায়ু সম্মেলন (কপ) : জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৬ সামনে রেখে গত ৩০-১০-২০২১ (শনিবার) তারিখে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে বিক্ষোভ করেছেন শত শত মানুষ। পরদিন রোববারও বিশ্বনেতাদের প্রতি একই দাবি নিয়ে রাজপথে ছিলেন অনেক পরিবেশ অধিকারকর্মী।

জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় থেকে পৃথিবীকে রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে বিশ্বনেতাদের চাপে ফেলতে বিভিন্ন দেশের পরিবেশ আন্দোলনকর্মীরাও বিক্ষোভ-সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ বিক্ষোভে যোগ দেন জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্দোলনে সাড়া জাগানো সুইডিশ পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ।

আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার যে, সবচেয়ে ক্ষতিকারক তাপমাত্রা এড়ানো মানে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমন অর্ধেক করা। কিন্তু কয়েক বছর আগেও যা ছিল অকল্পনীয়, তা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। অনেক দেশ ও প্রতিষ্ঠান এ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে কার্বন নির্গমন শুন্যে নামানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

তবে কি গ্লাসগো সেই স্থান হতে যাচ্ছে, যেখান থেকে বিশ্ব একটি শূন্য-কার্বন নির্গমন ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে এটি কখনোই সম্ভব নয় যে, একটি একক সম্মেলন থেকে তা অর্জিত হতে পারে। 'কপ' মানে কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ। এটি জাতিসংঘের একটি উদ্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরকারের জন্য বিশেষভাবে কপ ঠিক করা হয়। বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে সমস্যা মোকাবিলা করার একমাত্র ফোরাম হয়ে গেছে এটি। কিন্তু এটি প্রায় ২০০ দেশের ঐকমত্য নিয়ে কাজ করে। এসব দেশের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

তেল বা কয়লাসমৃদ্ধ অনেক দেশ জলবায়ু নিয়ে আলোচ্যসূচিতে সব সময় প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। তারা সবকিছুর গতি কমানোর চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো তাদের অস্তিত্ব নিয়ে হুমকির মধ্যে পড়ে সাহায্যের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ২০০৫ সালের সম্মেলন থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত একই চিত্র চোখে পড়ে। কপের বিরল সফলতা বলতে ২০১৫ সালের প্যারিস সম্মেলনকে ধরা যেতে পারে। জলবায়ু বিপর্যয় এড়াতে এসব দেশ ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাক-শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যাতে না বাড়ে, সে ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। এটাই প্যারিস চুক্তি। এই চুক্তির মানে হলো, ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কার্যত শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য দেশগুলো ব্যাপকভাবে নিঃসরণ কমাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ধোঁকাবাজি : অনেকে মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে সংকট, তা আসলে বিজ্ঞানীদের ধোঁকাবাজি। আবার অনেকের ধারণা, সরকার জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেই জলবায়ু পরিবর্তনের নামে ষড়যন্ত্র করছে। এসব গবেষণা, জরিপ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এএফপি বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষ দায়ী, এটি পুরোপুরি সত্য।

অনেকেই মনে করেন, জলবায়ুর বদল খুব স্বাভাবিক। প্রকৃতির নিয়মেই জলবায়ুতে বদল আসে। কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়। গত ৫০ বছরে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের তুলনায় দ্রুত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েছে। আইপিসিসি বলছে, ১৯৭০ সাল থেকে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে। শিল্পবিপ্লবের আগের সময় এবং ১৮৫০ সালের রেকর্ড করা তাপমাত্রার ভিত্তিতে এ ধরনের তথ্য দিয়েছে আইপিসিসি। এ সময়ের পলি, বরফ, গাছপালার যৌগিক বিশ্লেষণও করেছে আইপিসিসি।

অনেকে বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে মানুষ কার্বন নির্গমন বাড়ানোর কারণেই যে এমনটা ঘটছে, তা অনেকে মানতে চান না। আইপিসিসি জলবায়ু পরিবর্তনের একটি মডেল নিয়ে কাজ করছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কোন কোন বিষয় প্রভাব ফেলছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ মডেলে। এ বছর আইপিসিসির প্রতিবেদনে জানানো হয়, বায়ুমণ্ডল, সাগর ও ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য নিঃসন্দেহে মানুষই দায়ী।

* খত্বীব, গছাহার বেগ পাড়া জামে মসজিদ (১২ নং আলোকডিহি ইউনিয়ন), গছাহার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, চম্পাতলী জান্দিপাড়া ইসলামিক একাডেমি, চম্পাতলী বাজার, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

www.al-itisam.com

বিশ্বের অনেক দেশেই তীব্র শীত। এসব দেশে প্রচুর তুষারপাত হয়। এসব অঞ্চলের মানুষ মনে করে, বৈশ্বিক উষ্ণতা কিছুটা বাড়া খারাপ নয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়ার গড় ওঠানামা অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তন পরিমাপের মাপকাঠি। এক দিন অথবা এক সপ্তাহ তুষারপাত হলেই কয়েক দশক ধরে গড় উষ্ণতা বাড়েনি, এমনটা প্রমাণ হয় না।

বৈশ্বিক উষ্ণতা কিছুটা বাড়লে কী হতে পারে? সাইবেরিয়ার কিছু অংশ চাষযোগ্য হতে পারে। খাদ্যের জোগান দিতে পারে। তবে উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে এসব অঞ্চলের বরফ গলে আরও বড় সংকট তৈরি হতে পারে। আইপিসিসির বিজ্ঞানীরা বলছেন, দুই ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লেও সাগরের উচ্চতা আধা মিটার বা তারও বেশি বাড়তে পারে। এর প্রভাবে উপকূলবর্তী শহরগুলো ডুবেও যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে নানা যৌথ বিবৃতি আসে। তবে বিশ্লেষণের পর দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে খুব কমই জলবায়ুবিজ্ঞানী। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে ঐকমত্য থাকাটা খুব জরুরী। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে কয়েক হাজার জরিপ ও গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে মানুষ দায়ী, এ ব্যাপারে ৯৯ শতাংশের বেশি বিজ্ঞানী একমত পোষণ করেছেন।

বিজ্ঞানীদের সতর্কতা ও বিশ্ব নেতাদের ব্যর্থতা : দাবদাহ, দাবানল ও বন্যার মতো জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া তীব্রতর হচ্ছে। গত দশক ছিল রেকর্ড গরম। বিজ্ঞানীরা বারবার এ ব্যাপারে সতর্কতা উচ্চারণ করে আসছেন। বিশ্বের সরকারগুলো একমত যে, এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে যৌথ পদক্ষেপ দরকার।

কপ-২৬ সম্মেলনে বিশ্বের ২০০টি দেশের কাছে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কমানোর বিষয়ে তাদের পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হয়েছে। জলবায়ু বিপর্যয় এড়াতে এই দেশগুলো ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাকশিল্পায়ন যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যাতে না বাড়ে, সে ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। তবে এরই মধ্যে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রিতে সীমিত না রাখতে পারলে বিপর্যয় এড়ানো যাবে না। কপ-২৬-এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণকারী অলোক শর্মা ঘোষণা দিয়েছেন, প্যারিস যেখানে অঙ্গীকার করেছিল, গ্লাসগো সেখানে তা পূরণ করবে। তবে চুক্তির লক্ষ্য অর্জনে শীর্ষ দূষণকারী শিল্পোন্নত দেশগুলো কতটা পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত, সবার নজর আসলে সেই জি-২০-এর রোম শীর্ষ সম্মেলনের সমঝোতার দিকে।

জি-২০-এর নেতারা চলতি শতকের শেষে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তবে তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কী কী পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করবেন, তার সামান্যই প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো বা যতটা ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন হচ্ছে, ততটাই বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারণের বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।

এবারের জলবায়ু সম্মেলনকে (কপ-২৬) খুব বেশি আশাব্যঞ্জক মনে করা হচ্ছে না। এর সহজ কারণ, আগের সম্মেলনগুলোর ব্যর্থতা। আগের ২৫টি বড় সম্মেলনের পরও বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ঠেকিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব হয়নি। তিন দশক ধরে আলোচনার পরও শিল্পপূর্ব যুগের তুলনায় বিশ্ব ১.১ ডিগ্রি বেশি উষ্ণ। এ উষ্ণতা ক্রমেই বাড়ছে। এর আগে যে ২৫টি সম্মেলন হয়েছে তাতে খুব একটা সুফল পাওয়া গেছে, এমন নয়। নেতারা আলোচনা করেছেন, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব থেকে ক্ষণিকের ছুটি নিয়ে বিলাসবহুল সম্মেলনস্থলে কিছুটা হাত-পা মেলে অবকাশ যাপন করেছেন এবং নিজ দেশে ফিরে নব উদ্যমে আগের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন। সম্মেলনের কথা হয়তো ভুলেই গেছেন। ফলে ওই সম্মেলনগুলোকে অনেকে বিশ্ব নেতাদের বার্ষিক বনভোজন বলতেও দ্বিধা করেননি।

বিশ্বের সবচেয়ে কার্বন নিঃসরণকারী দেশ চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন কমানোর লক্ষ্য পূরণের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে দরিদ্র দেশগুলো। তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য দরিদ্র দেশগুলোকে গ্রিন টেকনোলজি বা পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি করেছিল ধনী দেশগুলো। কিন্তু এ জন্য যে অর্থ প্রয়োজন ছিল, এই ধনী দেশগুলো তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

উপসংহার : সবাই নির্গমন কমাতে তাদের বর্তমান প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকলেও এ শতকের শেষ নাগাদ বিশ্বে তাপামাত্রা বৃদ্ধি ২.৭ ডিগ্রির বিপজ্জনক পথেই থাকবে। তাই এবারের সম্মেলন ঘিরে প্রকৃত অগ্রগতির প্রত্যাশা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এর আংশিক কারণ, ঝুঁকি এখন ঘরে উঠে আসতে শুরু করেছে। এ বছরের বন্যায় জার্মানিতে ২০০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। শীতল কানাডায়ও তীব্র তাপদাহ দেখা গেছে। এমনকি সাইবেরিয়ার উত্তর মেরুও পুড়তে দেখা গেছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবারের সম্মেলনের কি আদৌ কোনো ভূমিকা আছে?

হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় করো এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ক হও

-জাবির হোসেন*

আপনি বাইক নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছেন। আপনার কাছে হেলমেট নেই, গাড়ির লাইসেন্সও নেই। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে এক ব্যক্তি আপনাকে বলল, ভাই! সামনে যাবেন না, পুলিশ আছে— গাড়ি আটকাচ্ছে।

এখন আপনি কী করবেন? তার কথা আপনি সত্য অথবা মিথ্যা ভাবতে পারেন। আপনি যদি মিথ্যা মনে করে এগিয়ে যান আর সামনে গিয়ে পুলিশের খপ্পরে পড়েন, তাহলে আপনার অনুশোচনার শেষ থাকবে না। আফসোস করবেন, 'হায়! আমি যদি তার কথা শুনতাম'। আর যদি তার ইনফরমেশন সত্য মনে করেন, তাহলে আপনি কখনোই সেই রুটে যাবেন না; বরং ফিরে যাবেন বা অন্য পথে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

এরই নাম হলো বিশ্বাস। আপনার বিশ্বাস এমন দৃঢ় যে, যেহেতু আপনার কাছে লাইসেন্স বা হেলমেট নেই, তাই ভয় করছেন সামনে যেতে, কিন্তু যদি আপনার কাছে এগুলো থাকত, তাহলে আপনার কোন ভয়ই থাকত না।

আমাদের জীবনে বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা চলে, বিশ্বাস ছাড়া দুনিয়া অচল। মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন, যাদেরকে আমরা নবী ও রাসূল বলে জানি। তাদের একমাত্র আদেশ ছিল, 'তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো, সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করো না'।

সর্বশেষ নবী ছিলেন মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন এক আসমানী গ্রন্থ আর তা হলো পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআন হলো সকল মানবের জীবনবিধান। তিনি আমাদেরকে ইনফরমেশন দিয়েছেন, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা আখিরাত সম্পর্কে। তিনি জানিয়েছেন, এই জীবন আমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। এই জীবন আমাদের মহান আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করতে হবে। এই জীবনে আমরা যদি আমাদের রবের ইবাদত করি, তাহলে পরকালের জীবন সুখের হবে। অপরপক্ষে যদি তা না করি, তাহলে আমাদের কষ্টের শেষ থাকবে না।

তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃত্যুর পরে কবরে দেহ রাখার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করবে তিনটি প্রশ্ন। উত্তর দিতে পারলে তো ভালো। যদি না পারি, তাহলে আমাদেরকে ফেরেশতাদের কাছে গ্রেফতার হতে হবে।

তিনি এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে এই ধরার বুকে। যিনি তার সমাজে বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সমাজ তাকে খেতাব দিয়েছিল 'আল-আমীন'। তিনি মানুষকে সতর্ক করলেন। তিনি সতর্ক করলেন না দেখা এক অস্তিত্ব সম্পর্কে, আর সেই অস্তিত্ব হলো জাহান্নাম।

তিনি বললেন, 'জাহান্নামের আগুনের তীব্র দাবদাহ, প্রজ্জ্বলন, অগ্নিশিখা দেহ ভক্ষণ করে আত্মায় প্রবেশ করবে। ঐ আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি উত্তাপসম্পন্ন হবে।

সেখানে প্রবেশকারীদের জন্য রয়েছে আগুন হতে প্রস্তুতকৃত পোশাক, বিছানা, ছাউনি, ছাতা, ভারী বেড়ি, আগুনের জিঞ্জির, আগুনে উত্তপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত কোটি কোটি টন ভারী লোহা, মুগুর এবং আসনসমূহ। আগুনে জন্মগ্রহণকারী উটের সমান বিষাক্ত সাপ ও খচ্চরের মতো বিষাক্ত বিচ্ছু। খাবার হিসেবে থাকবে আগুনে জন্মগ্রহণকারী কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ আর পান করার জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানি, দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত পুঁজ, ঘাম ও পাঁচড়া নিঃসৃত রক্ত'।[১]

যে জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তি হলো, যার দু'পায়ের তলায় রাখা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার, তাতে তার মগজ ফুটতে থাকবে।[২]

এই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য তিনি নিজ কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বিভিন্ন গোত্রকে সতর্ক করে বললেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আত্মরক্ষা করো। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না। হে বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোনো উপকারে আসবো না। হে আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না। হে ছাফিয়্যা! আল্লাহর রাসূলের ফুফু! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমার পক্ষে তোমার কোনো উপকারে আসা সম্ভব হবে না। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না'।[৩]

তিনি মুমিনদেরকে সতর্ক করে বললেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. বযলুর রহমান, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নাম (আছ-ছিরাত প্রকাশনী), পৃ. ২০৭।
২. ছহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/৬৫৬১।
৩. ছহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন্স), হা/২৭৫৩।

www.al-itisam.com

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*।

জাহান্নামের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন করছি। আমি তোমাদেরকে আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন করছি। আমি তোমাদেরকে আগুন থেকে ভয় প্রদর্শন করছি'।[৪]

তিনি আরো বললেন, 'তোমরা আগুন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো, যদিও তা এক টুকরা খেজুর (ছাদাক্বা করার) দ্বারাও হয়। আর যদি তাও না পাও, তবে উত্তম কথার দ্বারা'।[৫]

তিনি তাঁর নিজের স্ত্রীকে সতর্ক করলেন, 'হে আয়েশা! ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও। কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে'।[৬]

হে পৃথিবীর মানুষ! রাসূল ﷺ যে কথাগুলো বললেন, এগুলো কি মিথ্যা? যদি মিথ্যা হয়, তাহলে কেন মিথ্যা? তাঁর মিথ্যা বলার কী কারণ থাকতে পারে? তিনি তো ছিলেন আল-আমীন। তাঁকে কেউ কোনো দিন মিথ্যা কথা বলতে দেখেননি। না! তিনি মিথ্যা বলেননি। তিনি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দেওয়া আমানত যথাযথভাবে দুনিয়াবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এজন্য তাঁর ওপর চলেছে অত্যাচারের স্ট্রীম রোলার। তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অসহনীয় যন্ত্রণা। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। তাঁকে নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে, তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, তবুও তাঁর দুশমনেরা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিশনকে স্থগিত করতে পারেনি, থামাতে পারেনি তার অভিযাত্রাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তুমি যদি সম্পদ নিতে চাও, তোমাকে সেরা ধনী বানিয়ে দেওয়া হবে। তুমি যদি নেতৃত্ব চাও অথবা আরবের বাদশাহ হতে চাও, তাহলে তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হবে। অথবা, তুমি আরবের সুন্দরী নারীদের যাকেই চাইবে, তার সাথেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। দাবি একটাই— তুমি তোমার ঐ নতুন দ্বীনের দাওয়াত পরিত্যাগ করো'।[৭]

কিন্তু তিনি সবকিছুর প্রলোভন উপেক্ষা করে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তোমরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দাও, তবুও তাওহীদের দাওয়াত থেকে বিরত হবো না, আমি কখনোই আমার মিশন হতে এক বিন্দু পিছপা হব না'।[৮]

বন্ধু আমার! ভেবে দেখুন তো— তিনি কেন এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার স্বীকার হতে রাজি হলেন? কেন তিনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলতে গেলেন? বেশ তো ছিলেন! সমাজে তাঁর নামডাক সবই ছিল। কী দরকার ছিল নিজেকে সমাজের সমালোচনার মুখে ঠেলে দেওয়ার? ভেবে দেখুন! সত্যকে অনুসন্ধান করুন; ইনশাআল্লাহ সত্য এসে আপনার কাছে ধরা দেবেই।

এখন আমাদের কাছে এই ইনফরমেশন সত্য অথবা মিথ্যা— দুটির একটি মনে হতে পারে। যদি মিথ্যা মনে করি এবং আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী না চলে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে যখন ফেরেশতাদের সম্মুখীন হব, তখন কষ্টের অন্ত থাকবে না। সেদিন থাকবে না কোন সেকেন্ড চান্স। যদিও আমরা কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য সেকেন্ড চান্সের আপিল জানাব, 'হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের দেওয়া হতো, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলিকে তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন। আর তারা কখনো আগুন হতে বের হতে পারবে না' *(আল-বাক্বারা, ২/১৬৭)*।

আর যদি সত্য মনে করি, তাহলে আমাদের পরিবর্তন কোথায়? কেন আমরা সৃষ্টিকর্তার বাণীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি; যখন আমরা নিশ্চিত জানি যে, মৃত্যুর পর কবরে ফেরেশতারা প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে আছেন এবং আমাদের মৃত্যু যে কোনো সময় চলে আসতে পারে।

মনে করুন তো— লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকা সত্ত্বেও কি আপনি পুলিশের সামনে দিয়ে যাবার হিম্মত দেখাবেন? যদি দেখান, তাহলে আপনাকে বলা হবে— বেকুব। আর যদি না দেখাতে চান, তাহলে তাদের রোষানল থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে আগে প্রয়োজনীয় উপাদান জোগাড় করতে হবে।

যে জাহান্নাম থেকে নবী মুহাম্মাদ ﷺ সতর্ক করেছেন, আমরা যদি সেই জাহান্নামকে অবিশ্বাস করি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি, তাহলে আমাদের পরিণতি কী হবে— একবার কি ভেবে দেখেছি? আমরা কি এক সেকেন্ডের জন্য জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারব? —না!

(প্রবন্ধটির বাকি অংশ ৩৮ নং পৃষ্ঠায়)

৪. সুনান আদ-দারেমী, হা/২৮৫০।
৫. সুনান আদ-দারেমী, হা/১৬৯৪।
৬. সুনানে ইবনু মাজাহ, হা/৪২৪৩।
৭. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১৬৪-১৬৫।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

মনীষী পরিচিতি-১ : আল্লামা নাযীর আহমাদ রহমানী আযমগড়ী রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখসহ নানা ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় শিরক-বিদআত ও কুসংস্কারের আঁতুড়ঘর হলো এই ভারত উপমহাদেশ। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল এগুলো কাছাকাছি দেশ হওয়ায় এতে বিদ্যমান সমস্যাগুলোও প্রায় একই রকম। দ্বীন প্রচারে এখানকার ছহীহ দ্বীন প্রচারকারীগণ যে কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হন, তা বাস্তবে না দেখলে কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। অর্থনৈতিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিভিন্ন বিদআতী দল-সংগঠনের আস্ফালন, অন্যান্য ধর্মের কথিত অনুসারীদের অত্যাচার-নির্যাতন সয়ে সঠিক দ্বীন প্রচার করা যে কী পরিমাণ কঠিন কাজ তা সহজে অনুমেয়। পাক-ভারতে এমন অনেক সালাফী আলেম গত হয়েছেন এবং এখনো জীবিত রয়েছেন, যাদের জীবনের পুরো সময়টাই সংগ্রামমুখর। আজকের আলোচনায় আমরা তাদেরই একজন— শায়েখ নাযীর আহমাদ রহমানী রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

নাম-বংশ ও জন্ম: নাযীর আহমাদ ইবনু আব্দুশ শাকূর ইবনে জা'ফর আলী রাহিমাহুল্লাহ। ১০ যুলহিজ্জাহ ১৩২৩ হিজরী তারিখে (ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ খৃ.) ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় জেলার অন্তর্গত 'আমলূ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এটা প্রসিদ্ধ শহর মোবারকপুর থেকে এক মাইল পূর্ব দিকে এবং আযমগড় শহর থেকে ৬-৭ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত।

শিক্ষা ও প্রতিপালন : প্রাথমিক শিক্ষা মোবারকপুরে। এরপর মাওলানা ছাহেব সরাইমীরে অবস্থিত হামীদুদ্দীন ফারাহী প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুল ইছলাহ'-তে কিছুদিন পড়েছেন। অতঃপর 'মউ' (জেলা- আযমগড়)-এর মাদরাসা 'ফয়যে আম'-এ চলে যান। একই মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ-এর শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে উপকৃত হওয়ার অত্যন্ত ভালো সুযোগ লাভ করেন।

দারুল হাদীছ রহমানিয়া (দিল্লী) : শাওয়াল ১৩৩৯ হিজরী (১৯২১ খৃ.) যখন দিল্লীতে 'মাদরাসা দারুল হাদীছ রহমানিয়া' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয়েছিল, তখন তিনি ১৫ বছর বয়সে (যুলহিজ্জাহ ১৩৩৯ হি./১৯২১ খৃ.) এখানে এসে ভর্তি হন। এমনকি শা'বান ১৩৪৬ হিজরীতে এখান থেকেই আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি সকল পরীক্ষাতেই সর্বদা চমৎকার ফলাফল অর্জন করতেন।

শিক্ষকমণ্ডলী : তিনি অনেক বড় ওলামায়ে কেরাম হতে শিক্ষা অর্জন করেছেন। 'তুহফাতুল আহওয়াযী'-এর লেখক মাওলানা আব্দুর রহমান মোবারকপূরী রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম বুখারীর জীবনী লেখক মাওলানা আব্দুস সালাম মোবারকপূরী রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা আহমাদুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ (শায়খুল হাদীছ, দারুল হাদীছ রহমানিয়াহ), মাওলানা আবূ তাহের বিহারী রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা গোলাম ইয়াহইয়া পাঞ্জাবী কানপূরী রাহিমাহুল্লাহ, মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দালবী এবং মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেবদের ন্যায় কিংবদন্তিদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেন।

শিক্ষক পদে আসীন ও শিক্ষাসফর : সনদ অর্জনের পরে (শা'বান ১৩৪৬ হি.) দারুল হাদীছ রহমানিয়াতেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তখন তার বয়স মাত্র ২৩ বছর। যে বিষয়গুলোকে আমাদের দারসে নিযামীতে মাকূলাত বলা হয়, সেগুলো সম্পর্কে নাযীর আহমাদ রহমানীর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি সেই বিষয়গুলোতে আরও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং অন্তরকে পরিতৃপ্ত করার জন্য একই বছরে মাদরাসার মুহতামিম শায়েখ আতাউর রহমান, মাদরাসা রহমানিয়ার মুহতামিম-এর অনুমতিক্রমে 'বাদাউ'-এর প্রসিদ্ধ মাদরাসায়ে মাকূলাত 'শামসুল উলূম'-এ গিয়ে ভর্তি হন। এক বছর অবস্থান করে সেখানকার মাকূল এবং রিয়াযীতে দক্ষ আলেম মাওলানা আব্দুস সালাম কান্ধাহারী আফগানীর নিকটে অনেকগুলো দারসী ও গায়ের দারসী গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এরপর দিল্লী ফিরে আসেন এবং স্বতন্ত্রভাবে 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া'-তে আত্মনিয়োগ করেন। ইতোমধ্যে অক্টোবর ১৯৪৭ সনের খুন-খারাবির ঘটনাসমূহ ঘটতে লাগল এবং হিন্দুস্তান খণ্ডিত হয়ে ছোট উপমহাদেশটি বিভক্ত হয়ে হিন্দ ও পাকিস্তান-এর আকার ধারণ করল।

১৯৪৭ (১৩৬৬ হি.)-এর পর : এমন প্রতিকূল সময়ে তিনি এক বছর ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সনে দারুল উলূম আহমাদিয়া সালাফিয়া দারভাঙ্গাতে (বিহার প্রদেশ, ভারত) পুনরায় শিক্ষাদানের শুভ কাজের সুযোগ পান। সেখানে কম-বেশি এক বছর অতিক্রম হয়ে যায়। তারপর জানুয়ারি ১৯৫০ সনে বানারসের জামে'আহ রহমানিয়াতে আগমন করেন এবং আমৃত্যু সেখানে সংস্কারমূলক দাওয়াতী এবং লেখনী খেদমতসমূহ আঞ্জাম দিতে থাকেন।

মৃত্যু : তিনি ২৮ মুহাররম ১৩৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৫ সনে ৩০শে মে রবিবারে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং স্বীয় রহমতের বারিধারায় তাকে সিক্ত করুন- আমীন।

সন্তানসন্ততি : তিন পুত্র ও দুই কন্যা যারা স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত। তাছাড়াও এক ছেলে শায়খ হেলাল আহমাদের

ইলমী (খেদমতের) বিষয়টি স্মরণযোগ্য। যিনি 'জামে'আহ ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা' হতে ফারেগ হওয়ার পরে উল্লিখিত জামেআর পক্ষ হতে নাইজেরিয়াতে (আফ্রিকা) তাবলীগী এবং তাদরীসী খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন।

ছাত্রগণ : প্রায় ৪০ বছরব্যাপী পাঠদানের ফলে হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে থাকা ছাত্রদের বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা খুবই মুশকিল কাজ। তা সত্ত্বেও কতিপয় বড় ছাত্রের নাম নিম্নে উল্লেখ করছি—

(১) শায়খ আব্দুল গাফফার হাসান রহিমাহুল্লাহ (শিক্ষক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)। (২) শায়খ হাফেয ক্বারী আব্দুল খালেক রহমানী রহিমাহুল্লাহ (করাচী)। (৩) শায়খ আব্দুর রঊফ ঝান্ডানগরী রহিমাহুল্লাহ (হিন্দ)। (৪) শায়খ আব্দুর রহীম হুসাইনবী রহিমাহুল্লাহ (লাহোরী)। (৫) শায়খ আব্দুর রহীম ভূজিয়ানী অমৃতসরী রহিমাহুল্লাহ।[১] (৬) শায়খ ইকবাল বুদ্ধিয়াল রহিমাহুল্লাহ (হিন্দ)। (৭) শায়খ আযাদ রহমানী রহিমাহুল্লাহ। (৮) শায়খ মাজায আযমী রহমানী রহিমাহুল্লাহ। (৯) শায়খ আব্দুল জলীল রহমানী রহিমাহুল্লাহ। (১০) শায়খ আব্দুল হামিদ রহমানী রহিমাহুল্লাহ (তরজুমানে দিল্লীর বর্তমান পরিচালক) প্রমুখ।

জামা'আতী ও সামাজিক খেদমতসমূহ : একদিকে ইন্ডিয়ার 'অল-ইন্ডিয়া কনফারেন্স হিন্দ'-এর নতুন নতুন কার্যক্রম অব্যাহতধারায় চলছিল; অন্যদিকে হিন্দুস্তানের 'দ্বীনী তা'লীম'-এর মধ্যেও তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

পাঠদানের পাশাপাশি রচনা : সম্ভবত ১৯৩৩ সনে 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া দিল্লী'-এর পক্ষ হতে 'মুহাদ্দিছ' নামক একটি মাসিক পত্রিকা চালু ছিল। যার সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল হালীম নাযেম ছিদ্দীক্বী দারভাঙ্গী রহিমাহুল্লাহ। সহকারী সম্পাদক ছিলেন মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী রহিমাহুল্লাহ। অতঃপর যখন আগস্ট ১৯৩৫ সনে নাযেম ছিদ্দীক্বী রহিমাহুল্লাহ ইন্তিকাল করেন, তখন 'মুহাদ্দিছ'-এর সম্পূর্ণ যিম্মাদারী তার উপর বর্তায়। সে সময় তার অসংখ্য লেখনী প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে—

(১) রদ্দে আক্বায়েদে বিদ'ইয়াহ (প্রথম খণ্ড) : এটি ব্রেলভীদের সৃষ্ট মাসায়েল-এর উপর তাৎপর্যপূর্ণ ও ইলমী প্রবন্ধসমূহের সমাহার। যা পরবর্তীতে আগ্রহী পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার ভিত্তিতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে জনসমাদৃত হয়েছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পর্কে জানা যায়নি যে, তা গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত হয়েছে, না-কি হয়নি।

(২) অন্যান্য প্রবন্ধ : এ ব্যতীত দেশ ভাগের পর পত্রিকা ও পুস্তিকার মধ্যেও বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ লিখা অব্যাহত রেখেছিলেন। যেমন লাহোরের 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকাতেও তার কতিপয় লেখনী প্রকাশিত হয়েছিল।

(৩) আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত (আহলেহাদীছ এবং রাজনীতি) : এ বিষয়ে 'তারজুমান' দিল্লীর অনেকগুলো কিস্তিতে তার খুবই জ্ঞানগর্ভমূলক ও বিস্তারিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যেটা বর্তমানে সাড়ে চারশ পৃষ্ঠার মাঝারি আকারের গ্রন্থে মলাটবদ্ধ হয়ে বানারস হতে প্রকাশিত হয়েছে। আলেমদের মাঝে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

(৪) চামানে ইসলাম : দেশ ভাগের পর 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর অনুমতিক্রমে তিনি বাচ্চাদের জন্য ছোট ছোট চারটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেটা 'চামানে ইসলাম' নামে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তার নাম গ্রন্থটির উপর নেই, এটা হিন্দুস্তানে আহলেহাদীছ মাদরাসাসমূহের সিলেবাসভুক্ত। পাকিস্তানেও আল্লামা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর[২] প্রচেষ্টায় 'আহলেহাদীছ একাডেমি লাহোর' সেগুলোকে 'ইসলাম কী কিতাব' শিরোনামে প্রকাশ করেছেন।

(৬) আনওয়ারে মাছাবীহ : এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ। অত্যন্ত বিস্তারিত, প্রমাণপুষ্ট, লা-জবাব এই বইতে তারাবীহর মাসআলা আলোচিত হয়েছে। যেভাবে সূরায়ে ফাতেহার মাসআলার উপর 'তাহক্বীকুল কালাম' একটি সারগর্ভ গ্রন্থ। এটিই সেই গ্রন্থ, যেটি আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে এ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ নেটে বিদ্যমান। এটি দেওবন্দীদের বড় মুহাদ্দিছ হাবীবুর রহমান আযমী রহিমাহুল্লাহ-এর 'রাকআতে তারাবীহ' গ্রন্থের জবাব। যার কোনো পাল্টা জবাব আজও সম্মুখে আসেনি। বাংলা ভাষায় রচিত তারাবীহ বিষয়ক যাবতীয় বই মূলত হাবীবুর রহমানের বইটির উপর ভিত্তি করেই রচিত।

বাস্তবতা এই যে, মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী রহিমাহুল্লাহ বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম'-এর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখতেন। শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে তার খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল।

আমরা দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা এই ইসলামের প্রচারক, সুন্নাতের মহব্বতকারীকে স্বীয় খাছ রহমত দ্বারা ঢেকে দিন এবং ছালেহীনের সাথে জান্নাতের উচ্চস্থান দান করুন—আমীন।[৩]

---

১. তিনি অমৃতসরে মাদরাসা তাকবিয়াতুল ইসলাম-এ কয়েক বছর সফলতার সাথে পাঠদান করেছেন। ১৯৪৭ সালের দাঙ্গায় ভূজিয়ান জেলার অমৃতসরে শিখদের হাতে শহীদ হন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩০-৩২ এর কোঠায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

২. মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী রহিমাহুল্লাহ-ও অত্যন্ত বড় মাপের আলেম। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত রিজালবিদ শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ-এর উস্তায। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ পাওয়ার পরও তিনি নিজ দেশ পাকিস্তানেই আমৃত্যু দরস-তাদরীস ও ইসলাম প্রচারে রত ছিলেন।

৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : 'আনওয়ারে মাছাবীহ' এবং 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (৭-৩৫) গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকা।

বিয়ে নিয়ে ভাবনা

-ওমর ফারুক বিন মুসলিমুদ্দীন*

মূসা আলাইহিস সালাম-এর জন্য হিজরত অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। চলতে চলতে মূসা আলাইহিস সালাম মাদইয়ান নগরের দিকে চলে আসলেন।

[এক]

এই ঘটনাটুকু পাওয়া যায় কুরআনের সূরা আল-ক্বছাছের ২০ নাম্বার আয়াতের পর থেকে। ঘটনার পরম্পরা সাজালে এমন দাঁড়ায়— হাঁটতে হাঁটতে মূসা আলাইহিস সালাম একটা কূপের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, কিছু লোক সেই কূপ থেকে তাদের বকরিগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তিনি আরও দেখলেন, অল্প দূরে দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সাথেও বকরি। সেই বকরিগুলোও তৃষ্ণার্ত। কিন্তু বকরিগুলোকে পানি পান করানোর জন্য তারা কূপের দিকে এগিয়ে আসছে না। কুরআনে ব্যাপারটা বর্ণিত হয়েছে এভাবে, ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ ‘যখন সে মাদইয়ানের কূপের কাছে পৌঁছল, তখন সে একদল লোককে দেখল, যারা তাদের জন্তুগুলোকে কূপ থেকে পানি পান করাচ্ছিল। একটু দূরে সে দুজন রমনীকে দেখল, যারা নিজেদের পশু সমেত দাঁড়িয়ে আছে। তখন সে মেয়ে দুটোর কাছে গিয়ে বলল, কী ব্যাপার তোমাদের? তখন তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না রাখালেরা তাদের জন্তুদের পানি পান করিয়ে বিদায় হয়। আর আমাদের পিতা খুবই বয়োবৃদ্ধ’ *(আল-ক্বছাছ, ২৮/২৩)*।

মেয়েগুলো বলছে, ‘আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালেরা তাদের জন্তুদের পানি পান করিয়ে বিদায় হয়’। অর্থাৎ, মেয়েগুলো চাচ্ছে না যেখানে পরপুরুষরা উপস্থিত, সেখানে তাদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বকরিগুলোকে পানি পান করাতে। মজার ব্যাপার হলো, সেই অনেক অনেক যুগ আগ থেকেই যে মহিলা-পুরুষের ফ্রি মিক্সিং অপরাধ ছিল, ব্যাপারটা এই আয়াত থেকে প্রমাণিত। রাখালরা আছে বলে মেয়ে দুটো সেই কূপের কাছে যাচ্ছে না। দূরে অপেক্ষা করে আছে কখন রাখালদের কাজ শেষ হবে। এই আয়াত থেকে আমরা যা শিখব তা হলো— মিক্স গেদারিং একটা ফিতনা। তাই, নারীদের উচিত নয় পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করা, আর পুরুষদের উচিত নয় নারীদের সাথে অবাধ মেলামেশা করা।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে, ‘তাহলে মেয়ে দুটো একা একা বাইরে এলো কেন?’ উত্তরটা আয়াতেই আছে। মেয়েরা উত্তর দিয়েছিল, ‘আমাদের পিতা খুবই বয়োবৃদ্ধ’। অর্থাৎ, তাদের পিতার বাইরে আসার মতো সক্ষমতা নেই। তাই তারা বাধ্য হয়ে বকরিগুলো নিয়ে বাইরে এসেছিল সেগুলোকে পানি পান করাতে।

[দুই]

তাদের কথা শুনে এবং ঘরে বয়োবৃদ্ধ পিতা কন্যাদের জন্য অপেক্ষারত আছেন শুনে মূসা আলাইহিস সালাম-এর মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তিনি তাদের বকরিগুলোকে নিয়ে কূপের কাছে গেলেন এবং কূপ থেকে পানি পান করিয়ে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর, মূসা আলাইহিস সালাম একটা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পর উক্ত দুই মেয়ের একজন এসে মূসা আলাইহিস সালাম-কে বললেন, ‘আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। আপনি আমাদের উপকার করেছেন। আমার পিতা চান তার প্রতিদান দিতে’। কুরআনে ব্যাপারটা এভাবে এসেছে, ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ ‘তখন নারীদ্বয়ের একজন তার কাছে সলজ্জ পদে আসলো এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। আপনি আমাদের বকরিগুলোকে পানি পান করিয়েছেন। এজন্য তিনি চান আপনাকে প্রতিদান দিতে’ *(আল-ক্বছাছ, ২৮/২৫)*।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, কুরআন এই আয়াতে একটা ব্যাপারে জোর দিয়েছে। সেটা হলো— মেয়ে দুইটার একজন মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে এসেছেন সলজ্জভাবে। লজ্জার সাথে। কেন? কারণ— মূসা আলাইহিস সালাম তার কাছে পরপুরুষ। তাই, একজন পরপুরুষের সাথে কথা বলতে হলে একটা মেয়েকে যতোটা পর্দা-আবরু, যতটা বিনীত-সলজ্জ হতে হয়, ঠিক ততটুকুই এই মেয়েটার মধ্যে তখন ছিল।

আমরা যখন কোনো নন-মাহরামের সামনে যাই, আমরা যেন খোশগল্পে মেতে না উঠি। আমরা যেন এটা ভুলে না যাই যে, আমি যার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সে আমার জন্য মাহরাম নয়। তাই, তার সামনে যদি আসতেও হয়, যদি কথা বলতেও হয়, যথাযথ পর্দা-আবরু, সলজ্জ হয়েই যেন আসি। আর দরকারের অতিরিক্ত কথা যেন না বলি।

[তিন]

এরপরের কাহিনী সূরাটা আগাগোড়া পড়ে গেলে জানা যায়। মূসা আলাইহিস সালাম উক্ত ব্যক্তির ঘরে এলেন। অনেকের মতে উক্ত ব্যক্তি ছিলেন ইসলামের আরেক নবী শুআইব আলাইহিস সালাম।

* ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

এরপর, শুআইব আলাইহিস সালাম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার একটা কন্যাকে মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে বিয়ে দিতে চাইলেন। তবে, মূসা আলাইহিস সালাম তো তখন মুসাফির। বিয়ের মোহরানা তিনি কোথায় পাবেন? শুআইব আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি আমার এখানে আট বছর কিংবা দশ বছর কাজ করো। মেয়াদ পূর্ণ হলেই চলে যেয়ো। মোদ্দাকথা, শুআইব আলাইহিস সালাম-এর ঘরে মূসা আলাইহিস সালাম আট কিংবা দশ বছর কাজ করবেন। এটাই মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিয়ের মোহরানা। মূসা আলাইহিস সালাম সেটা মেনে নেন এবং দীর্ঘ দশ বছর শুআইব আলাইহিস সালাম-এর ঘরে কাজ করেন। দশ বছর পূর্ণ হলে তিনি তার স্ত্রী (যার সাথে শুআইব আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন) সহ অন্যত্র যাত্রা করেন।

এখান থেকে দুটো শিক্ষা :

প্রথমত, যেসব ভাই বিয়ে করেন কিন্তু মোহরানা প্রদান করেন না, কিংবা প্রদান করার ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপও করেন না, তাদের জন্য এই ঘটনায় ভালো রকমের শিক্ষা রয়েছে। মোহরানা প্রদান করার জন্য মূসা আলাইহিস সালাম দশ বছর মজুরির কাজ করতেও দ্বিধা করেননি। তাই, আমাদের উচিত স্ত্রীদের মোহরানার ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন হওয়া।

দ্বিতীয়ত, বিয়ে করার জন্য মূসা আলাইহিস সালাম শুআইব আলাইহিস সালাম-এর ঘরে দশ বছর শ্রমের কাজ করেছেন। একজন নবী তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দশটা বছর ব্যয় করেছেন এই কাজে। তাহলে ভাবুন, বিয়ে জিনিসটা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ? বিয়ে যদি খুব হালকা কিংবা যেমন-তেমন কোনো ব্যাপার হতো, মূসা আলাইহিস সালাম কখনোই নিজের জীবনের দশটা বছর এই কাজের জন্য ব্যয় করতেন না।

আমাদের যেসকল ভাই 'ইলম অর্জনের জন্য' চিরকুমার থাকার বাসনা হৃদয়ে লালন করেন, তাদের জন্য এখানে বিশাল শিক্ষা রয়েছে। ভাইয়েরা, বিয়ে কখনো ইলম অর্জনের পথে অন্তরায় নয়। যদি তা-ই হতো, মূসা আলাইহিস সালাম সেদিন শুআইব আলাইহিস সালাম-এর প্রস্তাবে রাজিই হতেন না। তাই, বিয়ে করুন। বিয়ের জন্য ফিকির করুন। আল্লাহর কাছে নেককার স্ত্রীর জন্য দু'আ করুন। আল্লাহ সবকিছু সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

'দিশারী'-এর বাকী অংশ

এক সেকেন্ড তো বহু দূরের কথা, এক মাইক্রো সেকেন্ডও জাহান্নামের আগুনে স্পর্শ হওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবুও যদি আমরা উদাসীন হই, জাহান্নাম থেকে অসচেতন থাকি, জাহান্নামকে মিথ্যা মনে করি; কাল যখন জাহান্নামে প্রবেশ করব, তখন আহ্বানকারী বলতে থাকবে, 'এটিই সেই জাহান্নাম! যাকে তোমরা মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিলে' *(আত-তূর, ৫২/১৪)*।

তাই তো জাহান্নামের ভয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে মুমিনেরা সর্বদা নিজেদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর করো, তার শাস্তি তো ভয়াবহ বিপদ' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৬৫)*।

আজ আমরা পুলিশকে যেমন ভয় করি, যার ফলে লকডাউনের সময় চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে ভয় পেয়েছি, অপ্রয়োজনে বাইরে বের হইনি, দোকানপাট খুলিনি— শুধু এই আশঙ্কায় যে, কখন না জানি পুলিশ চলে আসে। তার থেকেও বেশি ভয় করতে হবে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে। মেনে চলতে হবে স্রষ্টা প্রেরিত জীবনবিধান। জানি না কখন মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদের কাছে চলে আসবে।

পৃথিবীতে রোগ থেকে বাঁচতে কত গাইডলাইন মেনে চলছি। অদৃশ্য ভাইরাস থেকে বাঁচতে কত নির্দেশিকা ফলো করছি। মাস্ক পরে রাস্তাঘাটে বের হচ্ছি। কিন্তু মহান আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ম্যানুয়াল গাইড পাঠিয়েছেন— আমরা কি তা ফলো করছি? সেই ম্যানুয়াল গাইড হলো— পবিত্র কুরআন, যা আমাদের জীবনবিধান।

আসুন! আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের জীবন আলোকিত করি। মহান আল্লাহকে ভয় করি এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাই। তা না হলে, এমন যেন না হয়— আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কা না করে, রেকলেস জীবনযাপন করতে করতে হঠাৎ কবরে গিয়ে হাযির হয়েছি এবং কবরে আগুন্তুক ফেরেশতা মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের সম্মুখীন, 'মান রব্বুকা? —মা দ্বীনুকা? —মান নাবিয়্যুকা?' তখন যেন আমাদেরকে না বলতে হয়, 'হাহ্ হাহ্ লা-আদ্-রী অর্থাৎ আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না' *(এইচ. এম আবূ আকীব, মূল- মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী, ক্বরের বর্ণনা, আতিফা পাবলিকেশন্স, পৃ. ২৩)*।

জীবনের হিসেব

-মাহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনাখিলা, শেরপুর।

কীভাবে যে দিন হচ্ছে বিলীন
বরফ যেন গলে,
দেখতে দেখতে হায় শক্তি কমলো গায়
বয়স গেছে চলে।
জানি না যে ভাই শুধু খাই আর খাই
সবুর নাই যে মনে,
চলছে দ্রুত খুব বয়সের ছোপ ছোপ
আটকে না হায় গনে।
কেন আসলাম দিলাম না তো দাম
কর্ম নাইবা করে,
হলো যেন শেষ মরণ কবর দেশ
ফিরছি ঘরে।

হেদায়াত

-আযহারুল ইসলাম
উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

দেখিয়েছো যে পথ তুমি
সে পথ বড়ই সত্য,
তবু ভুল করে মন যদি
করে বসে হাজারও ভুল নিত্য,
তুমি দয়া করে ক্ষমা করো
সেই সত্য দিশায় আমায় তুলে ধরো।
পাপী আমি, সে কথা ভিন্ন
পথ খুঁজি, চাই প্রতিকার
দূর করে দাও জীবনের যত হাহাকার
মুছে দাও আছে যত প্রবৃত্তি হিংস্র ও কদাকার।
আমার জীবন, আমার মরণ
সব তোমাতেই হোক সমর্পণ।

অমৃত সুধা

-সাদিয়া জান্নাত নুরি
দি ইবনে সিনা ন্যাচারাল মেডিসিন লি.
সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

আল্লাহর নামে আছে কী জাদু
ঐ নাম জপিলে মন পায় যে মধু।
যার কৃপাতে বেঁচে আছি আলোকের দুনিয়ায়
তাঁর নামেতে মনেরই তাজ গড়িলাম হিয়ায়।
হিয়ার তাজে আল-কুরআন রাখিলাম যতনে
আল-কুরআনের আলোক-ছটা আসে আমার প্রাণে।
আল-কুরআনের মধুর বাণী জাগায় মনে ক্ষুধা
যতই যাচি ততই পাই অমৃত সে সুধা।
আল্লাহর নামে আছে কী জাদু
আল্লাহরই গান তাই তো আমি গেয়ে যাই শুধু।

গজনী অভিযান

-আব্দুল মুমিন
দাওরায়ে হাদীছ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

অরুণ প্রাতের তরুণ কবি জেগেছে বখতিয়ার,
ভেদিয়া নিশি আনিবে রবি খুলিবে রুদ্ধ দ্বার।
আর্ত-মানবের ক্রন্দন রোল শুনিছে বিশ্ব আজ,
দেখিয়া নবীনের ভালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ।
তোলো তকবীর, পড়ো তয়্যেবা, পরো রণসাজ,
বিন ওয়ালিদের খঞ্জন ধ্বনি শুনুক পৃথিবী আবার।
তোমার লহুতে ভিজুক ময়দান, টুটবে অন্ধকার।
শান্তির নামে নিরীহ জাতিকে করছে যারা দাস,
মানুষের হাতে মানুষের খুন সে অসুরের কাজ।
ও দাদা ঠাকুর দেখেছ বিলাই, দেখনি শার্দুল!
আমরা হলাম ঈসা-মেহেদীর দল উম্মাতে রাসূল।
ইমান মোদের এটমিক বোম্ব ঝঞ্ঝা তার বাহন,
এলাহী বিধান করিতে ক্বায়েম মোদের আগমন।
ক্বায়েমী শক্তি রুধিতে চালাও গজনী অভিযান।

সালাফী কনফারেন্স

-মো. জহুরুল
পশ্চিম হরিপুর, পোরশা, নওগাঁ।

দ্বীনের তরে নিজ মায়া ঝালিয়ে নিতে
এক ঝাঁক উলামায়ে কেরামের পরশ পেতে
অহীজ্ঞানে হৃদয়টা ভরিয়ে নিতে
চলো যাই একসাথে ঐ জামি'আহতে।
সারা দেশ থেকে জমায়েত হয় শ্রোতা
ইলম হাছিলে হেথা
জুড়ি নেই কোনো কথা
মোরা কেন বলো বাড়িতে বসা?
শুনে আসি সালাফী কনফারেন্স
দেখে আসি জামি'আর বেশ,
চলো ডাঙ্গিপাড়া, চলো রূপগঞ্জ
নিয়ে আসি দ্বীনের চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশ সংবাদ

দেশে এক বছরে স্ট্রোকে মৃত্যু দ্বিগুণ হয়েছে

গত এক বছরে দেশে ব্রেন স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত মৃত্যু দ্বিগুণ হয়েছে। ব্রেন স্ট্রোকের পাশাপাশি আশঙ্কাজনকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বা হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুও বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) একটি জরিপে উঠে এসেছে এসব তথ্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) তথ্য বলছে, দেশে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ২০১৯ সালে মারা গিয়েছিলেন ৪৫ হাজার ৫০২ জন। ২০২০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে ৮৫ হাজার ৩৬০ জনে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সচেতনতার ঘাটতি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য সেবনের প্রবণতা, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনসহ নানা কারণে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ছে। এ কারণে মৃত্যুও বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্যমতে, বিশ্বে অসংক্রামক ব্যাধির মধ্যে হৃদরোদের পরেই স্ট্রোকের অবস্থান। এ ছাড়া পঙ্গুত্ব বা শারীরিক অক্ষমতার জন্য স্ট্রোককেই বেশি দায়ী করা হয়। বিশেষজ্ঞরা জানান, স্ট্রোক দুই ধরনের। এক, রক্তনালি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দুই, রক্তনালি ফেটে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। স্ট্রোকের লক্ষণগুলো হলো শরীরের ভারসাম্য রাখতে সমস্যা হওয়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া, হঠাৎ করে চোখে কম দেখা, মাথা ঘোরানো, অচেতন হয়ে পড়া, শরীরের এক দিক অবশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, বিশ্বে বছরে দেড় কোটি মানুষ স্ট্রোকজনিত সমস্যায় ভোগে। এর মধ্যে স্ট্রোকে মৃত্যু হয় প্রায় ৫০ লাখের। বাকিদের স্ট্রোকের কারণে পক্ষাঘাতজনিত সমস্যা বরণ করে নিতে হয়। চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। তবে শিশুদেরও স্ট্রোক হতে পারে। বয়স বাড়লে স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে। সে হিসেবে মৃত্যুও বাড়বে। এছাড়া ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে চর্বি বেশি থাকা, ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য গ্রহণ স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। উল্লেখ্য, দেশের ৬৪টি জেলার ২৫ হাজার ২৮৭ মানুষের ওপর করা একটি জরিপের ফলাফলে বলা হয়, দেশে এখন প্রতি হাজারে ১১.৩৯ জন মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশে প্রায় ২০ লাখ স্ট্রোকের রোগী আছে। ৬০ বছরের বেশি মানুষের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি ৭ গুণ বেশি। নারীর চেয়ে পুরুষের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ। স্ট্রোকের প্রকোপ শহরের চেয়ে গ্রামে কিছুটা বেশি। আর বিভাগের হিসাবে ময়মনসিংহ বিভাগে স্ট্রোকের রোগী বেশি। এ বিভাগে প্রতি হাজারে ১৪.৭১ জন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়। সবচেয়ে কম রাজশাহী বিভাগে, ৭.৬২ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বিশ্বে ১০ বছরের মধ্যে খাদ্যের দাম সর্বোচ্চ

বিশ্বজুড়ে নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে খাদ্যপণ্যের দাম। গত ১০ বছরের মধ্যে খাদ্যের এই দাম এখন সর্বোচ্চ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) জানিয়েছে, এক দশকের মধ্যে বিশ্বে খাবারের দাম সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। গত বছরের তুলনায় ৩০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। জাতিসংঘের হিসাবে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে খাদ্যশস্য ও ভোজ্য তেলের। অক্টোবরে ভোজ্য তেলের দাম প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। সরবরাহ সমস্যা, নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া, কারখানা বন্ধ হওয়া এবং বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে খাবারের দাম বেড়ে যাচ্ছে। খাদ্যশস্যের দাম এক বছর আগের তুলনায় ২২ শতাংশ বেড়েছে। গত ১২ মাসে গমের দাম ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি খাদ্যশস্যের দাম বাড়ায় বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। বলা হচ্ছে প্রধান রফতানিকারক দেশ কানাডা, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে গমের আবাদ কম হওয়াই এর দাম বাড়ার কারণ। খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাওয়ার পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনকেও দায়ী করেছে এফএও। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। পাম, সয়াবিন, সূর্যমুখীর তেল ও সরিষার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোজ্য তেলের দাম বাড়ছে। তাছাড়া শ্রমিক সংকটের কারণে খাবার উৎপাদন ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তা পরিবহনের ব্যয় বেড়েও খাবারের দাম বেড়ে যাচ্ছে।

উইঘুর মুসলিমদের অঙ্গ বিক্রি করছে চীন!

জোর করে উইঘুর মুসলিমদের শরীর থেকে লিভার, কিডনির মতো অঙ্গ বের করে নিচ্ছে চীন। এমন অভিযোগ জমা পড়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে। একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে, চীন উইঘুর মুসলিমদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কালোবাজারি করে কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার 'হেরাল্ড সান' পত্রিকার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় দেড় লক্ষ উইঘুর মুসলিমদের বলপূর্বক বন্দি করে রেখেছে চীন। বন্দি অবস্থায় থাকা উইঘুর মুসলিমদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিশেষ করে কিডনি ও লিভার বের করে তারা কালোবাজারি করেছে। চীনে উইঘুর মুসলিমদের উপর অত্যাচার নতুন নয়। শিক্ষা দেওয়ার নামে 'ডিটেনশন ক্যাম্পে' নিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে চীনা প্রশাসন। বন্দিদের যৌনাঙ্গে ইলেকট্রিক শক, নিষিদ্ধ ওষুধ প্রয়োগসহ তাদের উপর নানা অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে মহিলা বন্দিদের

ধর্ষণের অভিযোগও। এই ক্যাম্পগুলোকে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নাম দিয়ে তাদের স্বীকৃতিও দিয়েছে বেইজিং। উইঘুর মুসলিমদের লিভার বিক্রি করে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা করে কামাচ্ছে চীন। এর মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার কামাই করছে তারা।

মুসলিম বিশ্ব

স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের পক্ষে ১৫৮ দেশ

১৯৬৭ সালে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের পরই ইসরাঈল পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয়। এরপর থেকে ওই এলাকায় ইয়াহূদী বসতি স্থাপনকারীদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কিন্তু হার মানেনি ফিলিস্তীন। ১৯৬৭ এর পর থেকেই আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় ও জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে নতুন সীমানা তৈরি করে পূর্ব জেরুজালেমকে নয়া ফিলিস্তীনের রাজধানী হিসাবে দেখতে চেয়েছেন ফিলিস্তীনীরা। এর অর্থ ফিলিস্তীনীরা চেয়েছেন সেলফ ডিটারমিনেশন বা তাদের রাষ্ট্র, তাদের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বীকৃতি। ইসরাঈল এই চেষ্টায় বারবার বাধ সাধলেও এতদিন পর জাতিসংঘের মঞ্চে ফিলিস্তীনের পক্ষে ভোট পড়েছে। প্রায় ১৫৮টি দেশ ফিলিস্তীনকে স্বাধীন ও দখলমুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে দেখার পক্ষে মত দিয়েছে। আর ইসরাঈল ও মার্কিন মিত্ররা বিপক্ষে ভোট দিয়েছে বা ভোট থেকে বিরত থেকেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে ফিলিস্তীনীদের পক্ষে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবে ফিলিস্তীনীদের সেলফ ডিটারমিনেশন (আত্মনিয়ন্ত্রণ) বা রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তীনের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে ভোটাভুটি হয়। অর্থাৎ ফিলিস্তীনকে একটি স্বাধীন এবং স্বকীয় রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নেওয়া হবে কি-না তা নিয়ে ভোট প্রদান করে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো। ফিলিস্তীনকে রাষ্ট্র হিসাবে মেনে নিতে ১৫৮টি দেশ পক্ষে ভোট প্রয়োগ করে, যেখানে ১০টি সদস্য দেশ (অস্ট্রেলিয়া, ক্যামেরুন, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস, কিরিবাতি, পাপুয়া নিউগিনি, রুয়ান্ডা, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টোগো টোঙ্গা) ভোট দেয়নি এবং প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ৬টি (ইসরাঈল, মার্শাল আইল্যান্ডস, মাইক্রোনেসিয়া, নাউরো, পালাউ, যুক্তরাষ্ট্র) দেশ।

ইয়ামান যুদ্ধে ১০ হাজার শিশু নিহত

ইয়মানে ২০১৫ সাল থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১০ হাজার শিশু হতাহত হয়েছে। দীর্ঘদিনের যুদ্ধের কবলে পড়ে ১০ হাজার শিশু নিহত হয়েছে অথবা চিরতরে পঙ্গুত্ববরণ করেছে। এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশটিতে প্রতিদিন চার জন শিশু নিহত হয়েছে। অনেক শিশুর মৃত্যু বা আহতের খবর অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। ইয়ামানের প্রতি পাঁচ শিশুর মধ্যে চার জনের মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। দেশটিতে চার লাখ শিশু মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছে এবং ২০ লাখ শিশু পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ২০১৪ সালে হুথি বিদ্রোহীরা ইয়ামানের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে উৎখাত করে দেশটির উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। ২০১৫ সালে ইয়ামানী সরকারকে সহযোগিতা এবং বিদ্রোহীদের দমনের লক্ষ্যে ইয়ামান যুদ্ধে যোগ দেয় সঊদী আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট। 'অপারেশন ডিসাইসিভ স্টর্ম' নামে সামরিক অভিযান পরিচালনা শুরু করে সঊদী আরব ও তার মিত্র দেশগুলো। তবে তাদের এই অভিযানে ইয়ামানের হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এছাড়া ঘরবাড়ি হারিয়েছে আরও কয়েক লাখ মানুষ। জাতিসংঘের মতে, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক সংকট চলছে ইয়ামানে। দেশটির ৮০ শতাংশ মানুষেরই জরুরী ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। পুরো ইয়ামান দুর্ভিক্ষের মুখে রয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বেরিয়ে আসছে হাজার বছর চাপা পড়ে থাকা ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া

এখন ইউরোপের আলপিন অঞ্চল বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহতার সাক্ষী। আশঙ্কাজনক হারে গলে যাচ্ছে এখানকার গ্লেসিয়ারগুলো। বেরিয়ে আসছে বরফের নিচে হাজার বছর ধরে চাপা পড়ে থাকা মাটি বা পার্মাফ্রস্ট। বরফে ঢেকে থাকা স্থানগুলো বেরিয়ে আসছে প্রতিনিয়ত, যেখান থেকে ক্ষুদ্র ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বেরিয়ে আসছে। মানব সভ্যতার জন্য যা হয়ে উঠতে পারে বড় হুমকির কারণ। বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে আল্পস পর্বতমালার গ্লেসিয়ার। সুইস বিজ্ঞানীরা বলছেন, বরফ গলে মাটি বের হওয়ায় হাজার বছর ধরে মাটি চাপা পড়ে থাকা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বেরিয়ে সূর্যালোকে এসে গরমে আবারও প্রাণ ফিরে পেতে পারে। বিজ্ঞানীরা আলপিনের পার্মাফ্রস্ট আর গ্লেসিয়ারে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তারা জানান, আমরা মনে করেছিলাম বরফের নিচের অংশটা জীবাণুমুক্ত কিন্তু এখন দেখছি বরফের নিচে এমনকি বরফের মধ্যেও জীবাণু আছে। হাজার হাজার উপকারী আর ক্ষতিকর অনুজীব পেয়েছেন তারা। তারা পার্মাফ্রস্টে ভাইরাসের উপস্থিতি পেয়েছেন। তবে এই ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহ হবে না। কিন্তু এভাবে বরফ গলা আর পার্মাফ্রস্ট বেরিয়ে আসতে থাকলে ভবিষ্যতে মানুষের জন্য মৃত্যুফাঁদ হতে পারে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : আমরা তো জানি যে, ইসলামের ছোট-খাটো যেকোনো বিষয় অস্বীকার করা কুফুরী। এখন ইসলামের ইখতেলাফপূর্ণ বিষয়গুলোর একটিকে স্বীকার করে ভিন্ন মতটিকে অস্বীকার করা কি ফুফুরী হবে? কেননা ভিন্ন মতটিও সঠিক হতে পারে।

-আকিবুল ইসলাম
রেলগেইট, ফেনী।

উত্তর : ইসলামের যে সমস্ত বিধানের ব্যাপারে মতভেদের সুযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে যদি উভয়টি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয় তাহলে যেটি বেশি যুক্তিযুক্ত তা পালন করতে হবে। আর যদি এমনটি হয় যে, একটি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত আর অপরটি প্রবৃত্তি অনুযায়ী হয়েছে। সে ক্ষেত্রে দলীল দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে আর অপরটি পরিহার করতে হবে। আর যদি কোনো মুজতাহিদ ইজতেহাদের মাধ্যমে কোনো ফতওয়া দিয়ে গিয়েছেন যা পরবর্তীতে ভুল সাব্যস্ত হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি পাপী হবেন না বরং নেকী পাবেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন বিচারক ইজতেহাদ করে বিচার করে এবং তা ঠিক হয় তখন দুই নেকী পান আর যদি ভুল হয়ে যায় তবুও এক নেকী পান (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৬)। তবে যদি তার অনুসারীরা জেনে-বুঝেও সঠিকটাকে অস্বীকার করে ভুলটিকে গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে তারা বড় ধরনের কুফরী করল। যা মূলত ঈমান ভঙ্গের কারণ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি তাদের মাঝে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী সমাধান প্রদান করো এবং তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না (আল-মায়েদা, ৫/৪৯)। অতএব একজন মুসলিম হিসাবে উচিত হবে দলীল সম্মত বিষয় গ্রহণ করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার করা।

প্রশ্ন (২) : আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে সব আমল বাতিল। কিন্তু কারো যদি মাতুরিদী আক্বীদা থাকে তার ইবাদাত কি কবুল হবে বা সে কি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে? এই আক্বীদা থাকলে সে কি জান্নাতে যেতে পারবে?

-শামসুজ্জামান
ছাতক, সুনামগঞ্জ।

উত্তর : যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আবূল মানসূর মাতুরিদীর অনুসারী তাদেরকে মাতুরিদী বলা হয়। আর তারা আল্লাহর গুণাবলির দূরবর্তী ব্যাখ্যা করে। যে সকল লোক মাতুরিদী আক্বীদায় বিশ্বাসী তাদের আমল যদি শরীয়া সম্মত হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় তা পরিতাজ্য বলে বিবেচিত হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে কেউ এমন আমল করল যা আমার দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয় তা পরিতাজ্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। আর যদি তা শরীয়া অনুযায়ী না হয় তাহলে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা নতুন জিনিস আবিষ্কার করা হতে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন জিনিসই হলো বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতের পরিণাম ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টাতা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়' (আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; মিশকাত, হা/১৬৫)। তাদের মাঝে এমন কোনো কর্ম পাওয়া যায় না যার মাধ্যমে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। বিধায় তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করা যাবে না। তবে তাদের কিছু আক্বীদা শরীয়া বিরোধী হওয়ায় তারা পাপী হিসাবে গণ্য হবে যা আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। যদি তিনি চান মাফ করবেন অন্যথায় শাস্তি দিবেন। তাদের জান্নাত-জাহান্নামে যাওয়ার বিষয়টিও অনুরুপ।

প্রশ্ন : (৩) কোনো মুসলিম ঈসা আলাইহিস সালাম (যিশু খ্রিষ্টের) -এর জন্মদিন (বড় দিন) উদযাপন করলে তাকে ঈমানদার বলা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
দিনাজপুর।

উত্তর : ইসলামে নবী-রাসূল, আলেম-উলামা বা যে কোনো ব্যক্তির জন্মদিন পালনের কোনো বিধান বর্ণিত হয়নি। আর দলীল ছাড়া ইবাদত বিদ'আত বলে গন্য হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল যা আমাদের শরীয়ার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/১৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। তা ছাড়া বড় দিন পালন করা এটা খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় অনুষ্টান। আর বিধর্মীদের যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করা, পূজার প্রসাদ খাওয়া, গান-বাজনায় অংশগ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম।

অন্য ধর্মের কোনো শিআর বা প্রতিকের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে অংশ গ্রহন করা স্পষ্ট কুফরী। আর মনে ঘৃণা পোষণ করে শরীক হলে হারাম হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিধর্মীদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহন করো না, তারা চায় তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে বিচ্ছুত হও’ (আলে ইমরান, ৩/১১৮)। তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন তালাশ করে, তার কোনো আমল গ্রহণ করা হবে না। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে’ (আলে ইমরান, ৩/৮৫)।

বর্তমানে একটি স্লোগান প্রচলিত আছে, ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার’। মূলত এ স্লোগান সামনে রেখেই অনেক মুসলিম নামধারীরা বিধর্মীদের উৎসবে শরীক হয় যা ঈমান ধ্বংসের দারপ্রান্তে পৌছে দেয়। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আসলেন তখন দেখতে পেলেন মদিনাবাসীরা দুইটি দিনে উৎসব পালন করছে। এ দেখে তিনি তাদের বললেন, ‘এই দুইটি কীসের দিন? তারা বলল, জাহেলী যুগ থেকে আমরা এ দুই দিনে উৎসব পালন করে থাকি। তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তা’আলা তোমাদের এ দুই দিনের পরিবর্তে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। সে দিন দুটি হলো ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর’ (মিশকাত, হা/১৪৩৯)।

প্রশ্ন : (৪) ঈসা আলাইহিস সালাম-কে কেন আল্লাহ তা‘আলা আসমানে উঠিয়ে নিয়ে ছিলেন? তার প্রার্থনার কারণে না-কি আল্লাহর ইচ্ছায়?

-আব্দুল্লাহ
ঢাকা।

উত্তর : ইয়াহূদীদের হত্যা ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা’আলা নিজ ইচ্ছায় ঈসা আলাইহিস সালাম-কে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তারা (ইয়াহূদীরা) ষড়যন্ত্র করল। আর আল্লাহ কৌশল অবলম্বল করলেন। আল্লাহ মহাকৌশলী। স্বরণ করুন, যখন আল্লাহ বললেন, ‘হে ঈসা! নিশ্চয় আমি আপনাকে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিব’... (আলে ইমরান, ৩/৫৫)।

শিরক

প্রশ্ন : (৫) নতুন বাড়ি নির্মাণের সময় মাটিতে রক্ত দেওয়া কি জায়েয?

-আজিজুল্লাহ
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : নতুন বাড়ি নির্মাণের সময় অপশক্তি বা অশরীরিকে কল্পনা করে রক্ত প্রবাহ করা বৈধ হবে না। বরং তা হবে স্পষ্ট শিরক। কারণ সকল রক্ত প্রবাহ আল্লাহর জন্য হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে রাসূল আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ এ সবকিছু জগৎসমূহের রবের জন্য’ (আল-আন’আম, ৬/১৬২)। তিনি অন্যত্র বলেন, ‘আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় এবং কুরবানী করুন’ (আল-কাওছার, ১০৮/২)। তিনি আরো বলেন, ‘তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে... যা নির্দিষ্ট আস্তানায় যবেহ করা হয় (আল-মায়েদা, ৫/৩)। আলি রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ অভিসাপ করেছেন; যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য যবেহ করে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৭৮)। তবে বাড়িকে শয়তানের সকল প্রকার অনিষ্ঠতা থেকে সংরক্ষিত রাখার জন্য সূরা আল-বাক্বারা পড়তে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরকে কবরস্থান বানিয়ো না, নিশ্চয় শয়তান সে বাড়ি থেকে পলায়ন করে যে বাড়িতে সূরা আল-বাক্বারা তেলাওয়াত করা হয়’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮০)।

পবিত্রতা- ওযূ- বীর্য

প্রশ্ন (৬) : স্বপ্নদোষ হওয়ার কারণে পোশাকে বীর্য লেগে রয়েছে। এই বীর্য লেগে থাকা পোশাকে ছালাত হবে?

-নাহিদ আলি
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : কাপড়ে ময়লা লাগলে যেমন কাপড় ধুয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে ছালাত আদায় করা উত্তম (আল-আ’রাফ, হা/৩১)। তদ্রূপ কাপড়ে বীর্য জাতীয় কিছু লাগলে তা পরিস্কার করে ছালাত আদায় করা উত্তম। বীর্য কাপড়ে শুকিয়ে গেলে তা নখ বা কাষ্ট টুকরা দ্বারা খুটিয়ে ফেলা যথেষ্ট আর যদি তা আদ্র থাকে তাহলে তা ধুয়ে নিতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড়ে লেগে থাকা বীর্য খুটিয়ে উঠিয়ে দিতাম অতঃপর সেই কাপড়ে তিনি ছালাত আদায় করতেন। (আবূ দাঊদ, হা/৩৭২; নাসাঈ, হা/২৯৭; ইবনু মাজাহ, হা/৫৩৭-৫৩৯)। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে দিতাম। অতঃপর তিনি সেই কাপড় পরিধান করে ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন। ধৌত করা পানির চিহ্ন কাপড়ে লক্ষ্য করা যেত। (ছহীহ বুখারী, হা/২৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৯; নাসাঈ, হা/২৯৬; ইবনু মাজাহ, হা/৫৩৬)।

প্রশ্ন (৭) : ছালাতে দাঁড়িয়ে একাধিক রাকা'আত পড়ার পর মনে পড়ল আমার ওযূ ছিল না। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : পূর্ব হতে ওযূ না থাকার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে স্বরণ হলে তৎক্ষণাত ছালাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওযূ করে পূর্ণ ছালাত আদায় করবে। এক্ষেত্রে আগের ছালাত বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। কেননা ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য পবিত্রতাকে শর্ত করা হয়েছে (আন-নিসা, ৪৩)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত কবুল হবে না যার ওযূ ভেঙ্গে গেছে যতক্ষণ সে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৫)। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ওযূ ব্যতীত আল্লাহ ছালাত কবুল করবেন না'। (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৪; তিরমিযী, হা/১৩৯; আবূ দাঊদ, হা/৫৯; ইবনু মাজাহ, হা/২৭৩)।

প্রশ্ন (৮) : ওযূ শুরু করলাম তারপর আমার সন্দেহ হলো যে, ওযূ ভেঙ্গে গেছে। আবার ওযূ করলাম এইভাবে বারবার সন্দেহ হচ্ছে আর বারবার ওযূ করছি এমতাবস্থায় আমার করনীয় কি?

-আব্দুল আওয়াল
-রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর : ওযূ করার পর ওযূ ভেঙ্গে গেছে মর্মে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ ওযূ ভঙ্গ হবে না এবং সে ওযূ দ্বারা যতো খুশি ছালাত আদায় করবে। সন্দেহের উপর নির্ভর করে বারংবার ওযূ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যার ছালাতে ওযূ ভেঙ্গে গেছে মর্মে সন্দেহ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا 'সে ব্যক্তি যতক্ষণ বায়ু নির্গমণের কোনো আওয়াজ বা গন্ধ না পায় ততক্ষণ যেনো সে ছালাত ছেড়ে না দেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৬১)। অর্থাৎ ওযূ ভেঙ্গে গেছে এমন সন্দেহ নির্ভর হয়ে যেনো ছালাত ছেড়ে না দেয়। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, সন্দেহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

ইবাদত- ছালাত

প্রশ্ন (৯) : ফরয ছালাতে দুই ব্যক্তি হলে পাশাপাশি দাঁড়ায়। এই দুই ব্যক্তি ফরয ছালাত আদায়ের মাঝে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আসলে কীভাবে দাঁড়াবে? এক পাশাপাশি না-কি ইমামকে সামনে চলে যেতে হবে?

-নাহিদ আলি
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : দুই ব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়রত অবস্থায় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি তাদের সাথে ছালাতে শরীক হতে চায়লে ইমাম তার পাশের ব্যক্তিকে পিছনে ঠেলে দিবে। অতঃপর তারা ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে।

জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ালেন। আমি এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের পেছন দিক দিয়ে আমার ডান হাত ধরলেন। আমাকে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর জাবের ইবনু সাখর আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দুজনের হাত একসাথে ধরে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। (ছহীহ মুসলিম, হা/৩০১০; মিশকাত, হা/১১০৭) উল্লেখ্য যে, সামনের পূর্ণ কাতার থেকে কোনো মুছল্লিকে টেনে নিয়ে কাতার বদ্ধ হওয়া মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ (ত্বাবারানী, আল মুজামূল কাবীর, হা/৩৯৪)।

প্রশ্ন (১০) : ছালাতের শেষ বৈঠকে পা বিছিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে বসতে হয়। এটা কি দুই রাকা'আত ছালাতের শেষ বৈঠকেও করতে হবে?

-রেদওয়ানুল কবির রাসেল
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ছালাত দুই রাকা'আত বিশিষ্ট হোক কিংবা চার রাকা'আত; ছালাতের শেষ বৈঠকে (অর্থাৎ যে বৈঠক শেষে সালাম ফেরানো হয়) নিতম্ব মাটিতে রেখে বসা সুন্নাত। যাকে হাদীছের ভাষায় تورك (তাওয়াররুক) বলা হয় (ছহীহ বুখারী, তিরমিযী, হা/৩০৪)।

প্রশ্ন (১১) : ছালাতে রুকূ করার সময় চোখ কোথায় রাখবো সিজদার জায়গায় না দুই পায়ের মাঝে?

-মেজবাহ
মাগুরা।

উত্তর : রুকূ অবস্থায় দুই পায়ের মাঝে দৃষ্টি রাখা যাবে না। বরং সিজদার স্থানেই রাখতে হবে। কেননা বৈঠকে বসা অবস্থা ব্যতীত ছালাতের সকল অবস্থায় একজন মুসল্লীর দৃষ্টি সিজদার স্থানে থাকবে। আর বৈঠকে বসা অবস্থায় ডান হাতের ইশারারত শাহাদাত আঙ্গুলির প্রতি থাকবে (নাসাঈ, হা/১২৭৫)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা গৃহে প্রবেশ করার পর সেখান থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর দৃষ্টি সিজদার স্থান হতে

সরাননি (মুসতাদরাক হাকেম, হা/১৭৬১; সুনানুছ-ছুগরা, হা/১৩৬৭)। ক্বিলাবা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুসলিম ইবনু ইয়াসারকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছালাতে মুসল্লীর দৃষ্টি কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, তোমার সিজদার স্থানে (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৬৫৬২)।

প্রশ্ন (১২) : ইমামের পিছনে ছালাত পড়লে কি 'আল্লাহু আকবর' 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা ফরয? না বললে ছালাত হবে কি?

-সৌরভ
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

উত্তর : ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণের জন্য। সুতরাং ইমাম যা যা করবে মুক্তাদীদের তা তা করা ফরয। অর্থাৎ ইমাম তাকবীর দিলে মুক্তাদীও তাকবীর দিবে। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا 'ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তার অনুসরণের জন্য। অতএব যখন সে তাকবীর দিবে তখন তোমরা তাকবীর দিবে, যখন সে রুকূ করবে তখন তোমরাও রুকূ করবে আর যখন সে সিজদা করবে তখন তোমরাও সিজদা করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৪১১)। তবে ইমাম **'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'** বলার সময় **'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ'** না বলে মুক্তাদী তার পরে **'রব্বানা লাকাল হামদ'** বলবে (ছহীহ বুখারী, ৬৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০৪)। সুতরাং স্বচ্ছায় ইমামের পিছনে তাকবীর, তাসবীহ কোনো কিছুই ছাড়া যাবে না। তবে ভুলে যদি ছুটে যায় তাহলে ছালাত হয়ে যাবে। এর জন্য মুক্তাদীকে কোনো সাহু সিজদা দিতে হবে না। কেননা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ব্যক্তিগত ভুলের কারণে সাহু সিজদা নেই।

প্রশ্ন (১৩) : ইমাম সামনে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে এবং মুছল্লীরা পিছনে নিচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : ইমাম উঁচু স্থানে এবং মুক্তাদী নিচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে না। আদি ইবনু ছাবেত রাহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে মাদায়েনে ছিলেন। ছালাতের জন্য ইক্বামত দেয়া হলে আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি দোকানের উপর (উঁচু স্থান) দাঁড়িয়ে ছালাতের ইমামতি করতে যান, মুক্তাদীগণ নিচু স্থানে দন্ডায়মান ছিলেন। হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হয়ে আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে তাকে নীচে নামিয়ে আনেন। আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু ছালাত শেষ করলে হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেননি, যখন কোনো ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে, সে যেন সমাগত মুছল্লী হতে কোনো উঁচু স্থানে দন্ডায়মান না হয়? তখন 'আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, এ জন্যেই তো আপনি যখন আমার হাত ধরেছেন আমি আপনার অনুসরণ করেছি (নেমে এসেছি) (আবূ দাউদ, হা/৫৯৮)। তবে উপরে ইমামের সাথে দুই-এক কাতার দাঁড়ালে নিচে থাকা মুসল্লিদের ছালাত জায়েয হবে।

প্রশ্ন (১৪) : মাগরিবের আযানের আগ মুহূর্তে মসজিদে ঢুকে কি তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছালাত পড়া যাবে?

-ফয়েজউল্লাহ
মিরপুর-১২।

উত্তর : তাহিয়্যাতুল মসজিদ তথা মসজিদে বসার পূর্বে দুই রাকা'আত ছালাতের নিষিদ্ধ কোনো সময় নেই। বরং যেকোনো সময় মসজিদে ঢুকলে তা পড়া যায়। তিন সময় ছালাত পড়া নিষিদ্ধ- ১. সূর্য উদিত হওয়ার সময় ২. সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ৩. সূর্য ঠিক মাথার উপর অবস্থান করার সময়। কেউ যদি এই নিষিদ্ধ তিন সময়েও মসজিদে প্রবেশ করে তার জন্যও বসার পূর্বে দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া আবশ্যক। আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার আগে দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করে নেয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪)।

প্রশ্ন : (১৫) অনেক সময় মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখি ইমাম সাহেব নেই, তার জায়গায় ইমামতি করছে সূদের সাথে জড়িত এমন ব্যক্তি। এমন সময় আমাদের করণীয় কী?

-আজগর আলী
শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইমামতির যোগ্য ব্যক্তি হলেন, কুরআন পাঠে পারদর্শী পরহেজগার ব্যক্তিগণ। আবূ মাসঊদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব পাঠে সবচাইতে অভিজ্ঞ। কুরআন পাঠে যদি সকলেই সমান হয় তবে যিনি তাঁদের মধ্যে সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ। তাতেও

যদি সকলে একরকম হয় তবে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতেও যদি সকলেই সমান হয় তবে যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩)। তবে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির পিছনে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা, ছাহাবায়ে কেরাম ফাসেক ইমামের পিছনেও ছালাত আদায় করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গিয়ে প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি লোকদের দিকে ঘুড়ে দাড়িয়ে ওয়াজ করতেন, উপদেশ দিতেন, আদেশ করতেন। আর লোকেরা কাতার বন্দি হয়ে বসে থাকতো। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, লোকেরা এ আমলের উপর ছিল। আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে আসলাম। সে ছিল মদিনার আমীর। আমরা ঈদগাহে আসলে দেখতে পেলাম একটি মিম্বর যা কাছীর ইবনু ছালত বানিয়েছে। মারওয়ান যখন ছালাতের পূর্বেই মিম্বরে উঠতে উদ্দ্যত হল, তখন আমি তার কাপড় টেনে ধরে বাধা দিলাম। সে আমার বাধা উপেক্ষা করে মিম্বরে উঠে ছালাত আদায়ের পূর্বেই খুৎবা দিলেন... (ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬)। সূদের কারণে কোনো পাপ হলে তার উপরই বর্তাবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে তার ছওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ত্রুটি করে, তাহলে তোমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে, আর ত্রুটি তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪; মিশকাত, হা/১১৩৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/১০৯৪৩)।

ইবাদত- যাকাত, ওশর

প্রশ্ন : (১৬) ইতোপূর্বে আমার সকল আবাদী জমিতে ধান চাষ হত। এখন আম চাষ হয়। আমার প্রশ্ন হলো 'আমরা আগে ধানের ওশর দিতাম। এখন কি আমের ওশর দিতে হবে? যদি দিতে হয় তাহলে আমের ওশর দেওয়ার পদ্ধতি জানাবেন।

-আব্দুন নূর
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : সাক-সবজি এবং পচনশীল ফল-মূলের যাকাত আদায় করতে হবে না। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সাক-সবজিতে যাকাত নেই'... (মিশকাত, হা/১৮১৩)। সুতরাং আম পচনশীল ফল হওয়ায় আমের যাকাত আদায় করতে হবে না। তবে কেউ যদি ব্যবসা করার জন্য আমের বাগান করে বা বাগান ক্রয় করে, তাহলে তাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে। যখন তার মূল্য নিছাব পরিমাণ হবে তথা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্য হবে এবং এক বছর অতিক্রম করবে, তখন তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত আদায় করবে। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ঐ পণ্যের যাকাত বের করতে আদেশ করতেন যা আমরা বিক্রির জন্য প্রস্তুত করতাম (মিশকাত, হা/১৮১১)।

প্রশ্ন (১৭) : অফিস থেকে ঋণ নিয়ে কিছু টাকা নগদ প্রদান করে ফ্ল্যাট ক্রয় করেছি এখন আরো ১০ লক্ষ টাকা পাবে। এই টাকা পরিশোধ করার জন্য আমি আমার নামে ব্যাংকে একটি ডিপিএস খুলেছি এবং মাসিক ১১ হাজার টাকা করে একাউন্টে জমা করছি। আগামী বছর ডিপিএসের মেয়াদ শেষ হবে তখন ফ্ল্যাট মালিককে টাকা দিব। এই অবস্থায় ডিপিএসের টাকার উপর যাকাত দিতে হবে কি?

-খন্দকার মামুন আফসার
ভাষানটেক, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত ডিপিএস একাউন্ট খোলাই জায়েয নয়। কেননা তা সুস্পষ্ট সূদের সাথে সম্পৃক্ত। আর সূদী কারবার সম্পূর্ণভাবে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। দ্বিতীয়ত যদি ডিপিএস এ জমাকৃত টাকা নেসাব পরিমাণ হয় এবং উক্ত নেসাবের উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রম হয়ে যায় তাহলে, বছরান্তে উক্ত টাকার মূলধনের উপর ২.৫% যাকাত প্রদান করতে হবে। আর যদি বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে যাকাত প্রদান করতে হবে না। সুতরাং ঋনগ্রস্ত ব্যক্তিদের উচিত হবে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করে দেওয়া। সায়েব ইবনু ইয়াযিদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন, উছমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলতেন, এই মাস (মাহে রমযান) যাকাত আদায়ের মাস। ঋণগ্রস্তদের উচিত তাদের ঋণ শোধ করে দেওয়া, যাতে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত আদায় করে নেওয়া যায় (মুয়াত্ত্বা মালেক, হা/৮৭৩)। উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ না করে দেয়, তাহলে বছরান্তে যাকাত আদায় করতে হবে।

ইবাদত- হজ্জ-উমরা

প্রশ্ন (১৮) : আমার উপর হজ্জ ফরয হয়নি। আমি কি উমরা করতে পারব? জনৈক ব্যক্তি বলেন, কারো যদি হজ্জ করার সামর্থ্য না থাকে সে কখনো উমরা করতে পারবে না। কথাটি কতটুকু সত্য?

-বেলকুচি
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : একজন জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তি চায়লে যেকোনো সময়ে উমরা পালন করতে পারে। উমরা করার জন্য যেমন পূর্বে হজ্জ করা জরুরী নয় তদ্রূপ প্রাপ্ত বয়স হওয়াও জরুরী নয়। বরং হজ্জে গেলে হজ্জের পূর্বে হাজীগণকে উমরা আদায় করতে হয় অথচ তখনো তারা হজ্জ পালন করেনি। ইক্বরিমা ইবনু খালেদ রহিমাহুল্লাহ ইবনু ইমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা–কে হজ্জ পালনের পূর্বে উমরা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। ইক্বরিমা রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ পালনের পূর্বে উমরা পালন করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৭৪)। অপর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে চারবার উমরা পালন করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৭৭৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৫৫-২১৯৭)। উল্লেখ্য যে, নাবালেগ সন্তান যার উপর ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ কিছুই ফরয হয়নি সে চায়লেও হজ্জ, উমরা করতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওহা নামক স্থানে একদল আরোহীর সাক্ষাৎ পেলেন এবং তিনি বললেন, তোমরা কোন সম্প্রদায়ের লোক? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল। এরপর এক মহিলা তাঁর সামনে একটি শিশুকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, এর জন্য হজ্জ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ; এবং তোমার জন্য এর ছওয়াব রয়েছে। (ছহীহ মুসলিম, 'শিশুর হজ্জ শুদ্ধ অধ্যায়' হা/১৩৩৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৯৮-৩১৮৭)।

ইবাদত- জানাযা, কাফন-দাফন

প্রশ্ন (১৯) : যারা বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মারা যায়, তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা হারিয়ে যায়। তাদের গোসলের বিধান কী?

-সাজিবুল ইসলাম
গাজিপুর।

উত্তর : এমন ব্যক্তিকে যদি গোসল করানো সম্ভব হয় তাহলে গোসল করাতে হবে। আর যদি দূর্ঘটনার কারণে এমনভাবে বিভৎস হয়ে যায় বা পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায় যাকে গোসল করানো অসম্ভব বা গোসল করালে গলে যাবে ইত্যাদী। তাহলে এমন মৃত ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করিয়ে কাফন দিতে হবে। কেননা তায়াম্মুম গোসলের স্থলাভিষিক্ত (আল-মুগনী, ২/২১০ পৃ.; মাজমু'উল ফতওয়া ইবুন বায, ১৩/১২৩ পৃ.; মাজমু'উল ফতওয়া ইবনু উছায়মীন, ১৭/৫০ পৃ.)। মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো' (আত-তাগাবূন, ১৬)।

প্রশ্ন : (২০) এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে মারা গেলে এনজিও থেকে যদি ঋণ মাপ করে দেওয়া হয় তাহলে কি সেই ঋণ মাপ হবে? এবং তারা যে দাফনের জন্য টাকা দেয় সেই টাকা নেওয়া যাবে কি?

-আজিজুল্লাহ
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : সূদী এনজিওর সাথে লেনদেন করা হারাম। কোনো ব্যক্তি যদি এমন সূদী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে থাকে তাহলে সে এর জন্য গুনাহগার হবে। তবে কোনো ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মাফ করে দেয় তাহলে মাফ হয়ে যাবে। সালেম রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না, বিপদে ফেলবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে লেগে থাকবে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে পাশে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো কষ্ট/বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে এর বিনিময়ে ক্বিয়ামতের বিপদ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন... (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; মিশকাত, হা/২০৪)। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে যদি সে ব্যক্তি একেবারেই নিঃস্ব হয় তাহলে, তার ছেলে-সন্তানরা সে দায়িত্ব পালন করবে অন্যথায় সরকারী ফান্ড থেকে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো সূদী এনজিও বা প্রতিষ্ঠান থেকে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হলে তা গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (২১) : জানাযার ছালাত জুতা পরিহিত অবস্থায় আদায় করা যাবে কি? না-কি জুতা খুলে রাখা আবশ্যক? দলীলসহ জানাবেন।

-আকবর আলি
ভারত।

উত্তর : ফরয, নফলসহ যেকোনো ছালাত জুতা খুলে অথবা জুতা পরিহিত উভয় অবস্থায় আদায় করা যাবে, কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

জুতা পরিহিত অবস্থায় ছালাত আদায় করেছেন'। তবে জুতা যেন অবশ্যই পবিত্র হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা ছাহাবীদের নিয়ে ছালাত আদায়কালে পায়ের জুতা খুলে ফেললেন। এটা দেখে তারাও তাদের জুতা খুলে ফেলল। তিনি ছালাত শেষে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা জুতা খুললে কেন?' তারা বলল, আপনি আপনার জুতা খুলে ফেলেছেন তাই আমরাও খুলেছি। তখন তিনি বললেন, 'জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে আমার জুতায় ময়লা লেগে থাকার কথা বলেছেন। তাই আমি আমার জুতা খুলেছি'। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন তার জুতা দেখে নেয়। আর জুতায় ময়লা লেগে থাকলে তা মুছে নিয়ে ছালাত আদায় করে' (আবূ দাউদ, হা/৬১০, 'সনদ ছহীহ; দারেমী', হা/১৩৭৮; মিশকাত, হা/৭৬৬)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, পবিত্র জুতা পরিহিত অবস্থায় ছালাত পড়া যায়। তাছাড়া অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দাফন শেষে মানুষ যখন কবরস্থান থেকে ফিরে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি কবর থেকে মানুষের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায় (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩৮; মিশকাত, হা/১২৬)।

ইবাদত- যিকির ও দু'আ

প্রশ্ন (২২) : কেউ যদি সকাল ও বিকাল সূর্যে উঠা ও ডোবার পূর্বে ১০০ বার সুবহা-নাল্ল-হ, ১০০ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ১০০ বার আল্লাহু আকবার ও ১০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে তাহলে, সে ১০০ উট, ১০০ জিহাদের ঘোড়া, ১০০ হজ্জ-উমরা ও ১০০ দাস মুক্ত করার নেকী লাভ করবে। এ হাদীছ কি ছহীহ?

-আব্দুল আলিম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীছটি হাসান তথা আমলযোগ্য ও গ্রহণীয় (ইবনু মাজাহ, হা/৩৮১০; 'হাসান'; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৯৫৬; মু'জামুল কাবীর, হা/১০৭১; আল-মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৭৬৯৪)।

পারিবারিক বিধান- পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ

প্রশ্ন (২৩) : বাবা মায়ের প্রতি মেয়েদের কী কী দায়-দায়িত্ব রয়েছে? ভরণপোষণের দায়িত্ব কি মেয়েদের উপর নেই?

সাহিদা আক্তার।

উত্তর : প্রথমত: পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা মর্মে বর্ণিত কুরআন ও হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের সেবা-শুশ্রূষার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের কোনো পার্থক্য নেই। পিতা-মাতার খেদমত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো... অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো' (আল-ইসরা, ২৩-২৪)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানগন তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অর্ন্তভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন হতে ভক্ষণ কর' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৫ আবূ দাউদ, হা/৩৫৩০; মিশকাত, হা/৩৩৫৪)। আসমা বিনতু আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকা। এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন কুরাইশদের সাথে হুদায়বীয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়েছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার মা আমার কাছে এসেছেন, তিনি আমার প্রতি আকৃষ্ট। সুতরাং আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তার সাথে উত্তম আচরণ করো' (মিশকাত, হা/৪৯১৩)। দ্বিতীয়ত: কন্যা সন্তানরা যেহেতু বিবাহের পর স্বামীর বাড়িতে চলে যায় আর ছেলে সন্তানরা পিতা-মাতার সাথে বাড়িতে থাকে এবং পিতা-মাতার সকল দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং উত্তরাধিকারী হিসাবেও কন্যার ডবল সম্পদ পেয়ে থাকে তাই ছেলের উপরই পিতা-মাতার খেদমতের মূল দায়িত্ব বর্তায় (আল-মুগনী, ৮/২১৯)। তবে, ছেলে সন্তানের অবর্তমানে মেয়ে তাদের পূর্ণ খেদমত করবে। আর তাদের বর্তমানে মেয়েরা সম্ভবপর তাদের খেদমত করার চেষ্টা করবে।

ইবাদত- মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন (২৪) : কিছু সংখ্যক বিদ্বেষী মুসলিম হয়েও যারা মসজিদ ভাঙ্গে কিংবা পুড়িয়ে দেয় তাদের জন্য বদ-দু'আ করা যাবে কি?

-মো. মাজহারুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়ার অর্থ হলো- মানুষকে আল্লাহর ইবাদত হতে বাধা প্রদান করা, মানুষকে মসজিদ বিমূখ বানানো যা কোনো মুসলিমের কাজ হতে পারে না। যারা মুসলিমদের মসজিদ ভাঙ্গবে আল্লাহর ভাষায় তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অত্যাচারী-যালেম। আর যালেমের বিরুদ্ধে মাযলুম ব্যক্তিগণ বদ-দু'আ করতে পারে এবং বদ-দু'আ করলে আল্লাহ তাদের বদ-দু'আ কবুল করবেন। এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাহার নাম স্বরণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় তার অপেক্ষা বড় যালিম কে হতে পারে? ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া এদের জন্য মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়। তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে রয়েছে মহা-শাস্তি'

(আল-বাক্বারা, ১১৪)। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আয (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তুমি মাযলুমের বদ-দু'আকে ভয় করবে। কেননা তার বদ-দু'আ আর আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরাল থাকে না অর্থাৎ সরাসরি কবুল হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৯)।

হালাল-হারাম- সূদ, ঘুষ, চাকুরী

প্রশ্ন (২৫) : আমি একটি টিভি চ্যানেলের কম্পিউটর পদে পর্দা মেন্টন করে চাকুরী করি। অতি প্রয়োজনে পুরুষদের সাথে কাজ করতে হয় ও কথা বলতে হয়। আমার এই চাকুরী বৈধ হবে কি? উল্লেখ্য যে, আমার কাজ নাচ-গানের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

-মোছাঃ খাদিজা আক্তার।
৩৩৫/১/এ, টিভি রোড রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

উত্তর : ইসলামে পর-পুরুষের সাথে সহবস্থান করে নারীর জন্য চাকুরীসহ কোনো কাজ করা বৈধ নয় যদিও তা পূর্ণ হিজাবসহ হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারী-পুরুষের সহবস্থানকে সরাসরি নাকচ করেছেন। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কোনো (গায়রে মাহরাম) নারী-পুরুষ যেনো নির্জনবাস না করে। কেননা (এমন হলে) তাদের তৃতীয়জন হবে শয়তান' (মিশকাত, হা/৩১১৮)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের সহবস্থান স্পষ্ট হারাম। আর টিভিতে বিভিন্ন অবৈধ অনুষ্ঠান, গান-বাজনা ইত্যাদী হয়ে থাকে যা স্পষ্ট হারাম। আর এধরণের চ্যানেলে চাকুরী করার দ্বারা এসকল হারাম কাজে সহযোগিতা হয়ে থাকে। আর অন্যায় কাজে সহযোগিতাও হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও নাফরমানীর কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (২৬) : আমার বাবা ডাক বিভাগে কর্মরত। যেখানে হালাল-হারাম মিশ্রিত। একদিকে সূদের কারবার অন্যদিকে নগদ চালু রয়েছে! এমতাবস্থায় আমার বাবার উপার্জন হালাল হবে কি?

-জুলকার
ঢাকা।

উত্তর : সূদী কারবারের সাথে জড়িত কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে না। কারণ এটিও পরোক্ষভাবে সূদী কারবারে সহযোগিতার শামিল যা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যকে সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর' (আল-মায়েদা, ৫/২)। নূ'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে অনেক সন্দেহজনক বিষয় যা অনেক মানুষই জানে না। যে ব্যক্তি এ সব সন্দেহজনক বিষয় হতে দূরে থাকল সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদ রাখতে পারল, আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে জড়ালো হলো সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ল। সাবধান! প্রত্যেক বাদশারই সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। সাবধান! আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়সমূহ (ছহীহ বুখারী, হা/৫২; তিরমিযী, হা/১২০৫; ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৮৪)। প্রশ্নের বর্ণনানুসারে যেহেতু উক্ত বিভাগে হালাল-হারাম মিশ্রিত রয়েছে যার সাথে জড়িত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে এবং সে অফিসে কর্মরত থাকায় হারাম বিষয়ে সহযোগিতা করতে হয় তাই ইসলামের নির্দেশনানুযায়ী এমন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী না করে বৈধ পন্থায় রিযিক অন্বেষণ করা উচিত।

প্রশ্ন : (২৭) আমি ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর কাজ করি। ক্লায়েন্টের আবেদনে আমি ওয়েবসাইট ডিজাইনে নারীর ছবি ব্যবহার করি। আমার প্রশ্ন হলো- এই উপার্জন আমার জন্য হালাল হবে কি? উল্লেখ্য যে, আমি যে ডিজাইন করছি তার উদ্দেশ্য সূদ, ঘুষ, মিথ্যা, হারাম পণ্যের প্রচার ও অশ্লিলতা ছড়ানো নয়।

-মাইনুল ইসলাম
আগ্রাবাদ, সিডিএ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ইনকামের টাকা হারাম হওয়ার জন্য ইনকামের মধ্যে একটি হারাম থাকাই যথেষ্ট বা একটি নারী ছবি অ্যাড দেওয়াই যথেষ্ট, অন্যান্য হারামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরী নয়। কেননা এই নারীর ছবি যত জন পুরুষ মানুষ দেখবে তত জনই চোখের গুনাহ করে হারাম কাজ করবে এবং সেই গুনাহর একটি অংশ আপনার ঘাড়ে এসে বর্তাবে। আর হারাম কাজে সহযোগিতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও নাফরমানীর কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে সৎ আমলের দিকে ডাকবে, যারা তা আমল করবে এবং নেকী পাবে সে তাদের সমপরিমাণ

নেকী পাবে। এটা তাদের নেকী থেকে বিন্দু পরিমাণ নেকী কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে পাপের পথ দেখাবে, তার জন্য তাদের সমপরিমাণ পাপ বরাদ্দ থাকবে যারা ঐ পাপের কাজে জড়িয়ে পড়বে। এটা তাদের পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণ পাপ হ্রাস করবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪ আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৯)।

প্রশ্ন (২৮) : ইউরোপ/আমেরিকায় বাসা ক্রয় করতে হলে ব্যাংক থেকে লোন নিতেই হয়। এছাড়া বাসা ক্রয় করা সম্ভবই নয়। ক্যাশ টাকা দ্বারা বাসা ক্রয় করলে অনেক সমস্যা হয়। এমতাবস্থায় ব্যাংক থেকে কি টাকা লোন নেওয়া জায়েয হবে? আর যারা অভিবাসী হয় তারা ১০০% মিথ্যা বলে অভিবাসী হয় এবং অভিবাসী হওয়ার কারণে প্রতিমাসে অভিবাসন ভাতা পায়। এইভাবে অভিবাসী হওয়া কি বৈধ হবে?

-আলিমুদ্দীন
প্যারিস।

উত্তর : ১. সূদী লোন নিয়ে বাসা-বাড়িসহ কোনো কিছুই করা যাবে না। কেননা সূদ একটি সুস্পষ্ট হারাম বস্তু। একজন মু'মিন-মুসলিম হিসাবে সূদ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যতোই সমস্যা হোক না কেন সূদের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম (আল-বাক্বারা, ২/২৭৫)। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ সূদ মিশ্রিত সম্পদকে সংকুচিত করেছেন' (আল-বাক্বারা, ২/২৭৬)। রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসাপ করেছেন, 'সূদ-দাতা সূদগ্রহীতা, সূদের সাক্ষী এবং এর লেখকের উপর এবং বলেছেন, তারা সবাই সমান পাপী' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৮; মিশকাত, হা/২৮০৭)। বিশেষ সুবিধার আশায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে অভিবাসি ভাতা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা মিথ্যা একটি মহাপাপ। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকো কারণ মিথ্যা অশ্লিলতার দিকে ধাবিত করে আর অশ্লিলতা জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮০৫; মিশকাত, হা/৪৮২৮)। এমন পরিস্থিতিতে হারাম ব্যতীত বৈধ পন্থায় বৈধ অর্থে বাড়ি নির্মাণ করবে অন্যথায় ভাড়া বাসায় বসবাস করবে।

প্রশ্ন (২৯) : পান কি নেশাদার দ্রব্যের অর্ন্তভুক্ত? পান চাষাবাদ বৈধ হবে কি?

-আব্দুর রহমান
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : পান চাষ করা যায়। কেননা পান পাতা মূলত হারাম বস্তু নয়। বরং তা খাওয়ার উপাদান হিসাবে নেশাদার বস্তুর মিশ্রণ হারাম। যেমনভাবে খেজুর, আঙ্গুর হালাল বস্তু। কিন্তু তা দ্বারা মদ তৈরি হয় বলেই খেজুর, আঙ্গুর খাওয়া বা চাষ করাকে হারাম বলা যাবে না। আর যা হারাম নয় তাকে হারাম বলা নিষেধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহ যেসব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না (আল-মায়েদা, ৮৭)।

প্রশ্ন (৩০) : ATM বুথের সিকিউরিটির চাকুরী হালাল হবে কি?

-বাসার আলি
চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : স্পষ্ট সূদের সাথ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের কোনো পদেই চাকুরী করা যাবে না। কেননা সূদ হারাম বস্তু আর সেই ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করার মাধ্যমে হারাম কাজে সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। হারাম কাজে সহযোগিতা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা পরস্পর নেকী ও আল্লাহভীতিতে সহযোগীতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' (আল-মায়েদা, ২)।

পারিবারিক বিধান- বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (৩১) : অবিবাহিত মেয়েকে বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে অবিবাহিত পুরুষ যেনা করে। এখন মেয়েটি গর্ভবতী। ছেলেটি ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক। ইসলামী শরীয়াতে এর সঠিক সমাধান কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে নারী-পুরুষের সকল সম্পর্ক হারাম। সুতরাং তাদের উপর হদ্দ (যেনার নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করতে হবে (আন-নূর, ২৪/২)। আর এই শাস্তি কার্যকরের দায়িত্ব সরকারের। আর তাদের মাঝে বিবাহের বিষয়টি এমন যে, বিচারক তাদের মাঝে বৈবাহিক বন্ধন সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করবে বা বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করবে। তবে যদি তাদের কেউ বিবাহতে অসম্মতি ব্যক্ত করে তাহলে, জোরপূর্বক তাদের মাঝে বিবাহ করানো যাবে না। উবায়দুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ رحمه الله তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, একজন ছেলে একজন মেয়ের সাথে অপকর্ম করল। অতঃপর উমার رضي الله عنه যখন মক্কায় আগমণ

করলেন তখন তার সামনে এই মামলাটি পেশ করা হলো। তিনি তাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা দুইজন এই অপকর্মের স্বীকারক্তি প্রদান করল। তিনি তাদের দুইজনকে (যেনার শাস্তি) বেত্রাঘাত করলেন এবং তাদেরকে একত্রিত করার (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার) আশা ব্যক্ত করলেন। ছেলেটি তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন (মুসনাদ আশ-শাফেঈ, হা/৩৮; সুনানুল কুবরা, হা/১৩৬৫৩)। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাদের সম্মান ও ইজ্জতের বিষয়টি ভেবে তাদের মাঝে বিবাহ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিন্তু ছেলে অসম্মতি থাকায় তিনি আর কিছু বলেননি। উল্লেখ্য যে, গর্ভের সন্তানটি ওয়ালাদু-যিনা (যেনার সন্তান) হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন (৩২) : স্ত্রী যদি স্বামীকে রাগ করে হোক বা মজাক করে হোক এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বলে, তাহলে কি তালাক হয়ে যাবে?

-ফজলে রাব্বী
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর : না; তালাক হবে না। তালাকের অধিকার একমাত্র স্বামীর। স্ত্রী তালাকের অধিকার রাখে না। অতএব স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিলে তালাক হবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ 'তালাক শুধু সেই দিতে পারে যে চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে (তথা স্বামী)' (ইবনু মাজাহ, হা/২০৮১; ইরওয়ায়ুল গালীল, হা/২০৪১)। তবে স্ত্রী যদি কোনো কারণে স্বামীর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তাহলে, উভয় পক্ষের মাঝে সালিশী প্রক্রিয়ায় স্বামীর নিকট হতে পূর্ণ মোহরানা (সম্মতিতে কম-বেশি হতে পারে) ফেরত দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে (আল-বাক্বারা, ২/২২৯)। ছাবেত ইবনু কায়েস এর স্ত্রী রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ছাবেত ইবনু কায়েসের দ্বীন বা চরিত্রের ক্ষেত্রে দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামে অবাধ্য হওয়াটা অপছন্দ করি। তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি কি চাও যে, তার বাগান ফিরিয়ে দিতে? যা সে তোমাকে মোহর স্বরুপ দিয়েছিল। উত্তরে বলল, হ্যাঁ। তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি বাগানটি গ্রহণ করে নাও এবং তাকে ছেড়ে দাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৭৩)।

প্রশ্ন (৩৩) : আমাদের জানা মতে, কোনো মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু জনৈক আলেম বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজে নিজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এ কথার কোনো ভিত্তি আছে কি?

-মাজহারুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : অলী (অভিভাবক) ব্যতীত বিবাহ বৈধ নয় একথাই ঠিক। হোক না সে কুমারী, বিবাহিতা বা অবিবাহিতা। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ 'অলী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই' (তিরমিযী, হা/১১০১; আবূ দাউদ, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৪৬; দারেমী, হা/২২২৮)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ 'অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোনো মহিলা বিয়ে করলে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল' (আবূ দাউদ, হা/২০৮৩; মিশকাত, হা/৩১৩১)। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ করিয়ে দাও' (আন-নূর, ৩২)। মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেন। কিছু দিন পর ঐ ব্যক্তি তার বোনকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেয়। পরবর্তীতে তারা দুইজন আবার বিবাহ করতে চায়লে মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার অসম্মতি প্রকাশ করে বলেন, لاَ وَاللهِ لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا 'আল্লাহর ক্বসম! সে তোমার নিকট কখনো ফিরে যাবে না'। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল কলেন, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ 'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তাহলে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে পুনর্বিবাহ করতে চায়লে তাদেরকে বাধা দিও না' (আল-বাক্বারা, ২৩২)। মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমি কি করব? তিনি বললেন, 'তাকে তার সাথে বিবাহ করিয়ে দাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৩০)। উপরে বর্ণিত আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নারী বিবাহিতা হোক কিংবা অবিবাহিতা তাকে তার অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষেই বিবাহ করতে হবে। অন্যথায় বিবাহ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৩৪) : আমি সাহিদা আক্তার। আমার বিয়ে হয় ২০০৯ সালে। বিয়ের ৩ মাস পর থেকে আমার স্বামীর সাথে কোন যোগাযোগ নেই। বিয়েতে তার আসল ঠিকানাও দেয়নি। নকল যে ঠিকানা দিয়েছে ঐ ঠিকানায় আমি কোর্ট থেকে তালাকের কাগজ পাঠাই। ঐ ঠিকানা তো সঠিক না আর তালাকও হচ্ছে না।

ইসলামি শরীয়া মোতাবেক আমি ২য় বিবাহ করার জন্য কি করতে পারি?

-তাকরিমা
শ্রীপুর, গাজীপুর।

উত্তর : কোনো মহিলার স্বামী নিখোঁজ হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে এবং সে জীবিত না-কি মৃত কোনোভাবে তা জানতে না পারলে, ঐ মহিলা চার বছর অপেক্ষা করবে। অতঃপর ঐ স্বামীকে মৃত ভেবে চার মাস ১০দিন ইদ্দত পালন করার পর চায়লে অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। এক্ষেত্রে তালাক প্রদানের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ 'যে নারীর স্বামী নিখোঁজ হয়ে যায় এবং জানতে পারে না সে কোথায়। তাহলে সে চার বছর অপেক্ষা করবে। অতঃপর চার মাস ইদ্দত পালন করে হালাল হয়ে যাবে (অর্থাৎ সে এখন অন্যত্র বিবাহ করতে পারে) (মুয়াত্বা মালেক, হা/২১৩৪)। সুতরাং আপনি চাইলে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।

প্রশ্ন : (৩৫) একবার খোলা নেওয়ার পরে তিন মাসের ভিতরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়বার স্বামী কোর্টের মাধ্যমে তালাক দিয়ে আবার তিন মাসের ভেতরে ফিরিয়ে নিয়েছে। তৃতীয়বার প্রথমে কোর্টে তালাক দিয়ে একমাস পরে আবার খোলা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আবার ফিরিয়ে নেওয়া যাবে কি?

উত্তর : এক. প্রথমবার খোলার মাধ্যমে বিচ্ছেদ হওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়ে নেওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা যদি নতুন বিবাহ ও নতুন মোহরের মাধ্যমে না করে সরাসরি ফিরিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে, তা বৈধ হয়নি এবং পরবর্তী ফিরিয়ে নেওয়া আবার তালাক দেওয়া কোনোটিই শরীয়া সম্মত হয়নি এবং এসবের কোনো ধর্তব্য নেই এবং প্রথম খোলার পরের সকল সম্পর্ক অবৈধ হয়েছে। সুতরাং এখন চায়লে নতুন মোহর নির্ধারণ করে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারে। কেননা খোলা তালাক নয় (মাজমুউল ফতওয়া, ৩২/৩০৬ পৃ. আল-ইসতেযকার,৬/৮২ পৃ.)। **দুই.** প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী যদি প্রথম খোলার পর নতুন মোহর ও বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী দুই তালাক হয়েছে। সুতরাং এখন চায়লে আবার নতুন মোহর ও বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তালাক দুইবার অতঃপর হয় স্ত্রীকে বিধিসম্মতভাবে রাখবে অথবা সদ্ভাবে বিদায় দেবে' (আল-বাক্বারা, ২২৯)। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রীকে রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে এরপর আবার তালাক দিলে ঐ স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

উত্তরাধিকার আইন- সম্পদ বণ্টন

প্রশ্ন (৩৬) : বাবার দুইটি ছেলে একটি মেয়ে। বড় ছেলে বাবার অসম্মতিতে পালিয়ে বিয়ে করায় বাবা ছোট ছেলে ও মেয়েকে সকল সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। বাবা কী কাজটি ঠিক করেছে? এর জন্য বাবা কি দায়বদ্ধ থাকবে?

-হাবিব
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : বাবার সম্পত্তিতে সকল সন্তানের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার বাবার মৃত্যুর পর সন্তানরা মীরাছ হিসাবে অংশহারে পেয়ে থাকে। তবে তিনটি কারণে ব্যক্তি তার মীরাছের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়- ১. দাসত্ব ২. হত্যা ৩. দ্বীনের ভিন্নতা । এই মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না। আর কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৬৪)। অন্যত্র বলেন, 'হত্যাকারী উত্তরাধিকারী পায় না' (আবূ দাউদ, হা/৪৫৬৪)। এই তিন কারণ ব্যতীত কাওকো তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যুলুম। আর যদি জীবদ্দশায় লিখে দিতে চায় তবুও ন্যায় সংগতভাবে শরীয়ত নির্ধারিত উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা অনুসারে সম্পদ বণ্টন করা আবশ্যক। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর পিতা তার জীবদ্দশায় তাকে একটি গোলাম প্রদান করলেন, অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাঁকে এই বিষয়ে সাক্ষী করতে আসলেন, তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পিতাকে বললেন, أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا » . قَالَ لاَ . قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ অর্থাৎ 'তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে অনুরূপভাবে সম্পদ দিয়েছ?' তার পিতা বললেন, না; রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করো, সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করো' নু'মান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, এরপর তিনি ফিরে এসে তার দান প্রত্যাহার করলেন। (ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৭; মিশকাত, হা/৩০১৯)। বাবা-মায়ের সম্মতিসহ বিবাহ করা ভালো। তবে ছেলে সন্তানের জন্য বাবার সম্মতি জরুরী নয়। সুতরাং ছেলে সন্তান বাবার অসম্মতিতে বিয়ে করার কারণে তাকে সম্পদ হতে বঞ্চিত করা শরীয়া সম্মত হয়নি। তাই এর জন্য বাবা দায়বদ্ধ থাকবে। বাবার উচিত পূণরায় সন্তানদের মাঝে ন্যায়-সঙ্গত বণ্টন বাস্তবায়ন করা।

প্রশ্ন (৩৭) : আমার প্রশ্ন- ধরা যাক, মায়ের সম্পত্তি ৪০ শতাংশ। স্বামী, ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও ১ মৃত কন্যা রেখে যদি মা মারা যায় তাহলে ৪০ শতাংশ হতে কে কত অংশ জমি পাবে তা কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী জানালে উপকৃত হবো।

-হাফিজুর রাহমান
রাজপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইসলামী শরীয়ার উত্তরাধিকার বণ্টন নীতিমালা অনুসারে প্রশ্নোল্লিখিত ৪০ শতাংশ সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে নিম্ন পদ্ধতিতে বণ্টিত হবে। স্বামী ১০% প্রত্যেক ছেলে পৃথক পৃথকভাবে ৮.৫৭% এবং কন্যা ৪.২৮% (আন-নিসা, ১১-১২)। উল্লেখ্য যে, মৃত কন্যা বা মৃত কন্যার কন্যারা কোনো সম্পদ পাবে না। কেননা ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে- ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তার কোনো উত্তরাধিকারী মারা গেলে সে উত্তরাধিকারী হবে না। অর্থাৎ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারী ব্যক্তির জীবিত থাকা আবশ্যক। নচেৎ উত্তরাধিকারী হবে না।

প্রশ্ন (৩৮) : একজন ব্যক্তির চার মেয়ে কোনো ছেলে নেই। এক মেয়ের স্বামী শ্বশুর বাড়িতে থাকে এবং শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা করে (তার নিজ পিতা-মাতা দুনিয়াতে নেই)। বাকি মেয়েরা তাদের কোনো ধরণের দেখাশোনা করে না। শশুর ঐ জামাইকে কিছু জমি দলীল করে দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো- ঐ জামাইকে শশুরের জমি লিখে দেওয়া কতটুকু শরীয়ত সম্মত হয়েছে?

-আতিকুল ইসলাম
দুবাই প্রবাসী।

উত্তর : অন্যকে সম্পত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি হলো- যে সকল ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে তাদের কোনো একজনকে পৃথকভাবে কেউ সম্পত্তি লিখে দিতে বা অছিয়ত করে যেতে পারবে না। তবে যারা ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয় না তাদেরকে কেউ চায়লে সম্পত্তি লিখে বা অছিয়ত করে দিতে পারে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩)। তবে তা যেন এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয়। সা'দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, মক্কায় আমি অসুস্থ থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন, আমি তাকে বললাম, আমার কিছু সম্পদ রয়েছে আমি আমার সকল সম্পদ অছিয়ত করে দিতে চাই। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, না; আমি আবার বললাম, তাহলে অর্ধেক অছিয়ত করে দেই। তিনি বললেন, না; আমি আবার বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করে দেই। তিনি বললেন, হ্যাঁ; এক তৃতীয়াংশ ঠিক আছে। এক তৃতীয়াংশই বেশি (ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৫৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৮)। জামাই যেহেতু শশুর-শাশুড়ির উত্তরাধিকারী নয় তাই শশুর-শাশুড়ি চায়লে তাদের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ জামাইকে লিখে দিতে পারে। তবে মেয়ের নামে লিখে দিলে অন্যন্য মেয়েদেরকেও সমপরিমাণ লিখে দিতে হবে।

অর্থনৈতিক বিধান- ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রশ্ন (৩৯) : আমার বাবা কিস্তিতে চাউলের ব্যবসা করেন। নগদ বিক্রি করলে কিছুটা কম দামে বিক্রয় করেন, বাকিতে বিক্রি করলে ২০০/৩০০ টাকা বেশি দামে বিক্রয় করেন। এমন ব্যবসা হালাল হবে কি? (ক্রেতা তার সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করেন এর জন্য অতিরিক্ত কোন টাকা দিতে হয় না)।

-আহসানুল হক
কুলনিয়া, দোগাছি, পাবনা।

উত্তর : নগদে কম মূল্যে আর বাকিতে বেশি মূল্যে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। তবে এর জন্য মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারিত হতে হবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন রকমের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতো। তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, তার উচিত অগ্রিম দেওয়া নির্ধারিত পরিমাপে এবং নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত (ছহীহ বুখারী, হা/২২৩৯; মিশকাত, হা/২৮৮৩)। ইক্বরিমা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এমন চুক্তিতে কোনো সমস্যা নেই যে, নগদ মূল্যে এত আর বাকি মূল্যে এত (মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা, হা/২০৮২৬, ২০৮২৭)।

প্রশ্ন (৪০) : অর্থনৈতিক লেনদেনের মুদ্রা হিসাবে কাগজের মুদ্রা কতটুকু শরীয়া সম্মত?

-হাসান
দক্ষিণ কোরিয়া।

উত্তর : ১. অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রা হিসাবে কাগজে নোটের ব্যবহার শরীয়া সম্মত। কারণ ১. বর্তমান বিশ্বব্যাপী প্রচলিত কাগজের মুদ্রা মূলত স্বর্ণ বা রৌপ্যের মূল্যমান যা তাবেঈগণের যুগে উমায়্যা খলীফা আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ান আরবীতে লেখা দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), ফালস (তাম্রমুদ্রা) প্রচলন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রার প্রচলন হয় (আল-মুদাউওয়ানাহ, ৩/২৯ পৃ.)। ২. আর যেকোনো দেশ

টাকা তৈরির জন্য তার সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য রিজার্ভ ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর সে মূল্য পরিমাণ কাগজের নোট তৈরি করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমান প্রচলিত কাগজের নোটের সতন্ত্র কোনো মান না থাকলেও তার পরিবর্তে জমাকৃত স্বর্ণ বা রৌপ্যের কারণে তা স্বর্ণ বা রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ কাউন্টারে টাকা দিয়ে টিকিট কেটে গেটম্যানকে টাকা না দিয়ে কাগজ দেখিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার মতো। কাগজের নোট লেনদেনের ক্ষেত্রে বর্তমান বিদ্বানগণ এই নোটকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে তুলনা করেছেন। ইবনু বা'য রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কাগজের নোট একটি আরেকটির সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত (মাজমূ'উল ফতওয়া ইবনু বা'য, ১৯/১৫৮ পৃ.)। এছাড়াও ইবনু তাইমিয়্যা ও ইবনুল ক্বায়্যিম রহিমাহুল্লাহ স্বর্ণ ও রৌপ্যের সূদের বিষয়টিকে তার মূল্যমান কাগজের নোটের সাথে সংযুক্ত করেছেন (মাজমূ'উল ফতওয়া ইবনু তাইমিয়্যা, ২৯/৪৭১-৭২ পৃষ্টার আলোচনা দ্র.; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ইবনুল ক্বইয়্যিম, ২/১৫৬ পৃ.)। সূদের বিধান কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে কাগজের নোট স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় (আবহাছু হাইয়াতি কিবারিল উলামা, ১/৮৫ পৃ.)।

প্রশ্ন : (৪১) আমি একটা সেলাই মেশিন ক্রয় করতে চাই। মেশিনটির বর্তমান মূল্য ৭০০০ টাকা। আমি পনেরশো টাকা নগদ প্রদান করে বাকি টাকা তিন মাস পরে দিতে চেয়ে ক্রয় করতে চাই। বাকি টাকা পরে পরিশোধ করতে চাওয়ায় দোকানদার আমার কাছ থেকে ১০০০ টাকা বেশি নিতে চাচ্ছে এভাবে মেশিন ক্রয় করা বৈধ হবে কি?

-মো: মিঠুন মিয়া
বদরগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : বৈধ হবে। নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ বা কিস্তিতে নির্দিষ্ট পণ্যের মূল্য পরিশোধের শর্তে পণ্যের বর্তমান বাজার মূল্য থেকে অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে আপোষে নির্ধারণ করে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন/আদান-প্রদান করলে তা লিখে রাখো... (আল-বাক্বারা, ২/২৮২)। তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে খেও না। কিন্তু যদি তা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে (তাহলে খেতে পারো) (আন-নিসা, ৪/২৯)। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এক ক্রয়-বিক্রয়ে দুইবার ক্রয়-বিক্রয় করা সূদ হিসেবে গণ্য হবে। তবে কেউ যদি বলে নগদ নিলে এত টাকা এবং বাকিতে নিলে এত টাকা (তাহলে হালাল হবে) (মুছান্নাফ ইবনু আবি শায়বা, হা/২০৮২৭)। উল্লেখ্য যে, কোনো মাসের কিস্তি অনাদায়ে যদি অতিরিক্ত সূদ চাপানো হয় তাহলে, সে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে।

প্রশ্ন (৪২) : আমি জনৈক ব্যক্তিকে ইটের দাদনের ব্যবসার জন্য কিছু টাকা দিয়েছি। তিনি ৬-৮ মাস পর ইট বিক্রি করে যাই লাভ হোক না কেন আমাকে প্রতি ইটের বিনিময়ে ১ টাকা করে লাভ দেন। গত বছর ব্যবসা কম হওয়াতে ৫০ পয়সা লাভ দিয়েছেন। তবে এখানে ঝুঁকির বিষয় হলো, যদি ব্যক্তিটি মারা যান তাহলে আমার মূল টাকাটা না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন প্রশ্ন হলো, ১. আমার জন্য এই ব্যবসা হালাল কি-না? ২. আমি যে টাকা ইনভেস্ট করেছি তার যাকাত দিতে হবে কি-না?

-হিলালুদ্দীন
উখিয়া, কক্সবাজার।

উত্তর : একজনের পরিশ্রম অপর জনের মূলধন লভ্যাংশ উভয়ের মাঝে শতকরা হারে বণ্টিত হবে মর্মে যে ব্যবসা করা হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মুদারাবা বলা হয়। এই ব্যবসা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- ১. লাভ নির্ধারিত করা যাবে না ২. লাভ-লোকসানের ভাগিদারী হতে হবে (দারাকুৎনী, হা/৩০৭৭, মুয়াত্তা, হা/২৫৩৫; ইরওয়া, হা/১৪৭২; 'বুলুগুল মারাম মওকুফ ছহীহ')। যেহেতু প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানের হিসাব না করে লাভ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে তাই এই দাদন ব্যবসা বৈধ হবে না। বরং এই লাভের টাকা সূদ হিসাবে বিবেচিত হবে (মুসলিম, হা/ ১৫৯৮; মিশকাত, হা/ ২৮০৭ 'ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়')। তাছাড়াও মূলধন ফেরত না পাওয়ার আশঙ্কা থাকায় ধোকার সম্ভবনার কারণে এই ব্যবসা জায়েয নয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَلْخَدِيْعَةُ فِى النَّارِ 'ধোকাবাজ জাহান্নামে যাবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/ ১৫৯৮; মিশকাত, হা/ ২৮০৭ 'ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়')। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোনো প্রকার ধোঁকা নেই (ছহীহ বুখারী, ২৪০৭; মিশকাত, হা/২৮০৩)।

বৈধ-অবৈধ- পাকা চুল তোলার বিধান

প্রশ্ন (৪৩) : পাকা চুল তোলার বিধান কী?

-নিয়ামুল হাসান
শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : পাকা চুল তুলে বা উপড়ে ফেলা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

আমর ইবনু শু'আইব রহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ; فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ. مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً 'তোমরা সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা এটা মুসলিমদের জন্য আলো স্বরুপ। বস্তুত ইসলামের মধ্যে থাকাবস্থায় যে ব্যক্তির একটি পশম সাদা হবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন (আবূ দাউদ, হা/৪২০২; মিশকাত, হা/৪৪৫৮)। অপর বর্ণনায় রয়েছে, كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'তা তার জন্য ক্বিয়ামত দিবসে হবে আলো' (প্রাগুক্ত)।

মানবধিকার- মর্যাদাহানী করন

প্রশ্ন (৪৪) : কোনো মুসলিম যদি অমুসলিমের মর্যাদার হানি করে এবং দুনিয়াতে ক্ষমা না চায় তাহলেও কি বিচারের মাঠে মুসলিমের নেকী কেটে অমুসলিমকে দিয়ে দেওয়া হবে? যে অমুসলিম সে তো এমনিতেই জাহান্নামে যাবে, সে নেকী নিয়ে কি করবে?

-মো: মোস্তফা কামাল
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : না; মুসলিমের নেকী কেটে অমুসলিমকে দেওয়া হবে না। তবে মুসলিম ব্যক্তি গুনাহগার হবে। একজন মুসলিম ব্যক্তির মর্যাদাহানী করা যেমন হারাম অনুরূপ একজন অমুসলিমের মর্যাদাহানী করাও হারাম এবং একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট এমন হতে পারে না। এমন ব্যক্তির পরিণাম জাহান্নাম। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىءِ مَنْ سَمَّعَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا دَخَلَ النَّارَ 'মু'মিন খোঁটা দানকারী, অভিশাপকারী, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হয় না। যে ব্যক্তি কোনো ইয়াহূদী বা খ্রিস্টানের দোষ বর্ণনা করে বেড়ায় সে জাহান্নামী' (তিরমিযী, হা/১৯৭৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪৮৬০ 'হাদীছ ছহীহ')। তবে যুদ্ধ ক্ষেত্র হলে ভিন্ন বিষয়।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য- আক্বীকা

প্রশ্ন (৪৫) : জনৈক আলেম বলেছেন, আক্বিকার ছাগলের জন্য দাঁত বা এক বছর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-রমজান আলি
নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কুরবানীর পশুর ন্যায় আক্বিকার পশুর জন্য দাঁত বা বছর পূর্ণ হওয়া আবশ্যক নয়। বরং ছেলে সন্তানের জন্য যেকোনো বয়সের দুইটি ছাগল আর কন্যা সন্তানের জন্য যেকোনো বয়সের একটি ছাগল হলেই যথেষ্ট হবে। কেননা যে সকল হাদীছে দাঁত বা বছরের শর্তারোপ করা হয়েছে তার সবগুলোই কুরবানীর সাথে সম্পৃক্ত। আর আক্বিকার পশুর বিষয়টি ব্যাপক বা শর্তহীন (ইবনু মাজাহ, হা/৩১৬২; মিশকাত, হা/৪১৫২; নাইনুল আওতার, ৫/১৪৫ পৃ.)।

হাদীছ- ছহীহ-যঈফ

প্রশ্ন (৪৬) : যারা মিউজিক শুনে তাদের কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-রাহাত
মিরপুর-১০।

উত্তর : যারা মিউজিক শুনে তাদের শাস্তির ব্যাপারে কঠিন হতে কঠিন শাস্তির কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এই উম্মতের জন্য ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের আযাব হবে। জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তা কখন ঘটবে? তিনি বললেন, 'যখন গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার ঘটবে এবং মদ্যপান দেখা দিবে (তিরমিযী, হা/২২১২; মিশকাত, হা/১০৬)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরণের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন' (মিশকাত, হা/৪৫০৩ 'হাদীছ ছহীহ')। তবে কানে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং তা জাল (সিলসিলা যঈফা, হা/৪৫৪৯ 'বাতিল হাদীছ'; ছহীহ ওয়া যঈফ আল-জামে' আছ-ছগীর, হা/১২১৮৮)।

প্রশ্ন (৪৭) : রাসূল ﷺ একদিন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বললেন, আজ তুমি যা চায়বে তাই তোমাকে দেবো, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা মেরাজের রাত্রির এক গোপন তথ্য জানতে চাইলেন যা শুনে আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু কেঁদেছিলেন। অনেকে বলেছেন যে, ঘটনাটি বুখারীতে আছে। এই ঘটনা সত্য কতটুকু?

-জাকির হোসেন
গোপীনাথপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উত্তর : না; এমন কোনো হাদীছ ছহীহ বুখারীতে নেই এবং এমন কোনো ছহীহ হাদীছ নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (৪৮) : 'নূরনবী' নাম রাখা কি ঠিক?

-আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ
ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।

উত্তর : এমন নাম রাখা যাবে না যার অর্থ সুন্দর নয় এবং আক্বীদা বিনষ্টকারী। 'নূরনবী' অর্থ নূরের নবী। এ নাম মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস থেকে বলা হয়ে থাক যে, তিনি নূরের তৈরি বা তিনি আল্লাহর নূরের অংশ 'নাউযুবিল্লাহ' যা সরাসরি শিরক। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন! আমি কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ' (আল-কাহাফ, ১১০)। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদের মতই

একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল কর তেমন আমিও ভুল করি (তবে তিনি অহীর ক্ষেত্রে কোনো ভুল করেননি)। তবে যদি আমি ভুলে যাই তাহলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৪০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৫৭২)। অসতর্কতা বা অজ্ঞতা বসত কারো এমন নাম যদি রেখে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তার এই নাম পরিবর্তন করে সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখা জরুরী। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলার আছিয়া (অবাধ্য) নাম পরিবর্তন করে জামিলা (সুন্দরী) রেখেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৩৯; তিরমিযী, হা/২৮৩৮)।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৯) : আমরা মুসলিমরা নামের আগে কেন মো. লেখি? এইভাবে মো. লেখা কি ঠিক?

-আরমান মোল্লা
ভেকুটিয়া, যশোর।

উত্তর : মুসলিম পুরুষের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' এবং মেয়েদের নামের পূর্বে 'মুসাম্মাৎ' লেখা বা বলার নিয়ম নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে ছিল না। এমনকি আরব দেশগুলোতে এখনো নেই। এই নিয়মটি ভারত উপমহাদেশেই বেশি প্রচলিত। তবে এরূপ করাতে কোনো আপত্তি নেই। কেননা যতদূর জানা যায়, বৃটিশ আমলে ভারতে হিন্দুরা যখন ঢালাওভাবে হিন্দু-মুসলিম সবার নামের আগে শ্রী, শ্রীযুক্ত (যা তাদের নিকট সম্মানসূচক শব্দ) ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করে এবং রাষ্ট্রীয় নথিপত্রে ঐ শব্দগুলো যখন হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমদের নামের শুরুতে বসানোর ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে, তখন মুসলিমগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নিমিত্তে তাদের পুরুষদের নামের আগে শ্রী প্রভৃতির পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ' ও মহিলাদের নামের আগে শ্রীমতী-এর পরিবর্তে 'মুসাম্মাৎ' চালু করেন।

প্রশ্ন : (৫০) কেউ যদি তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে অসহায় মানুষকে টাকা কিংবা অন্যান্য সহায়তা দেয়, তাহলে সেটা কি নেকীর কাজের অর্ন্তভুক্ত হবে?

-আব্দুল্লাহ
ময়মনসিংহ।

উত্তর : ইসলাম ধর্মে উৎসবের দিন দুইটি ১. ঈদুল আযহা ২. ঈদুল ফিতর। বাকি সকল উৎসব বিদ'আত। ছাহাবীগণ কখনো নিজের কিংবা কারো জন্মদিন পালন করেননি এবং এদিনকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো আমল করেননি। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর দেখলেন তাদের দুটি দিন ছিল। এ দিন দুটিতে তারা খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ করত। (এ দেখে) তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ দুটি দিন কি? তারা বলল, ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়্যাতের সময় এ দিন দুটিতে আমরা খেলাধূলা করতাম। এ কথা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দুদিনের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য আরো উত্তম দুটি দিন দান করেছেন। এর একটি হলো ঈদুল আযহার দিন ও অপরটি ঈদুল ফিতরের দিন' (নাসঈ, হা/১৫৫৬; মিশকাত, হা/১৪৩৯)। জন্ম দিনকে কেন্দ্র করে সমাজে যা প্রচলিত আছে তার সবই বিজাতীয় কুসংস্কার ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী সভ্যতায় এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই। কেননা নির্ধারিত দিনে কোনো কল্যাণ বা বরকত রয়েছে মনে করা শিরক। আবূ ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়নের যুদ্ধে বের হলেন, তখন তিনি মুশরিকদের এমন এক গাছের নিকট দিয়ে গমন করলেন, যাতে তারা নিজেদের অস্ত্রসমূহ ঝুলিয়ে রাখত। উক্ত গাছটিকে 'যাতু আনওয়াত' বলা হত। এটা দেখে কোন কোন নতুন মুসলিমরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সমস্ত মুশরিকদের মতো আমাদের জন্যও একটি 'যাতু আনওয়াত' ধার্য করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিস্ময় প্রকাশে) বললেন, 'সুবহা-নাল্ল-হ মূসা আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ও তাকে বলেছিল, 'হে মুসা! আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য নির্ধারণ করে দিন যেরূপ ঐ কাফের সম্প্রদায়ের উপাস্য রয়েছে' (আল আ'রাফ, ৭/১৩৮)। তোমরাও তো সেরূপ কথা বললে, সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমরা ঐ সকল লোকদের পথ অনুকরণ করে চলবে, যারা তোমাদের আগে অতীত হয়ে গেছে (মিশকাত, হা/৫৪০৮)।

সালাফী কনফারেন্স

৫ম বার্ষিক ২০২১ | সময়সূচি | ৬ষ্ঠ বার্ষিক ২০২২

২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর, ২০২১
বৃহস্পতিবার, বাদ আছর হতে শুরু
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

১৩ ও ১৪ জানুয়ারি, ২০২২
বৃহস্পতিবার, বাদ আছর হতে শুরু
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

বক্তব্য পেশ করবেন:
দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

সভাপতি: **শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন;
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ
সার্বিক সহযোগিতায় : নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ব্যবস্থাপনায় | মিডিয়া পার্টনার: Al-Itisam, আল-ইতিছাম, Al-Itisam TV

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর তত্ত্বাবধানে

ফুল ফ্রি স্কলারশিপ

রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ শাখায়

শ্রেণি: ছানাবিয়্যা ও দাওরায়ে হাদীছ
ফরম সংগ্রহের তারিখ: ১ ডিসেম্বর -৩০ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
ভর্তি পরীক্ষা: ২ জানুয়ারি ২০২২
বি.দ্র. আসন সংখ্যা সীমিত
ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকায় শিক্ষার্থীগণ প্রাধান্য পাবে।

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা | ০১৯৪৭-৯০৫৫৭০
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী | ০১৪০৭-০২১৮২২

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলি দ্বারা পাঠদান
- উন্নতমানের ইলমী সিলেবাস
- কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ
- গবেষণা ও লেখালেখির সুযোগ
- ফ্রি প্রাথমিক চিকিৎসা
- ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা
- মাসিক ছাত্র বৃত্তি প্রদান
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আবেদন করার সুযোগ

ইয়াতীম শিশুদের জন্য সুখবর

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত **আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ**-এর রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ উভয় শাখায় দুই শতাধিক ইয়াতীম ছাত্র-ছাত্রী প্রতিপালিত হয়ে আসছে। ২০২২ ইং শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠান নতুন করে আরো একশত জন ইয়াতীম ছাত্র-ছাত্রী প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আপনার আত্মীয় বা পরিচিত জন কেউ ইয়াতীম থাকলে তাকে দ্বীনী পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ করে দিন। ভর্তি করতে ইচ্ছুক অভিভাবককে ১ জানুয়ারি, ২০২২ ইং, রোজ শনিবার প্রার্থীসহ উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

ভর্তির শর্তাবলি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :

- ইয়াতীম শিশুর বয়স ১৬ বছরের নিচে হতে হবে।
- পিতার ডেথ সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে।
- পিতার এনআইডি কার্ডের (জাতীয় পরিচয়পত্র) ফটোকপি।
- ২ কপি সদ্য তোলা ছবি।
- শিশুর জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট।
- সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

ইয়াতীম ছাত্রের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা সেবা, টিউশন ফি, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা সরঞ্জামসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সম্পূর্ণ ফ্রি প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

সহযোগিতার ঠিকানা ও অ্যাকাউন্ট নাম্বার :
Account name : Nibras Yatim Kollan Fund
Account No : 2050 113020 4367 600

Monthly Al-Itisam الاعتصام 6th Year, 2nd Part, December 2021, Price : 25.00

'যে জ্ঞানার্জনের পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।
(মুসলিম, হা/২৬৯৯; আবূ দাউদ, হা/৩৬৪১)

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ কর্তৃক পরিচালিত
যুগোপযোগী মানসম্মত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আবাসিক/ অনাবাসিক

ভর্তির আবেদন (শুধু অনলাইনে) : ১ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত
■ ভর্তি পরীক্ষা : ১ জানুয়ারি ২০২২ ■ ক্লাস শুরু : ৮ জানুয়ারি ২০২২

শাখা	বালক শাখা	বালিকা শাখা
নারায়ণগঞ্জ	হিফয বিভাগ ও ১ম শ্রেণি থেকে কুল্লিয়্যা	১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি
রাজশাহী	হিফয বিভাগ ও ১ম শ্রেণি থেকে কুল্লিয়্যা	হিফয বিভাগ ও ১ম শ্রেণি থেকে কুল্লিয়্যা
বরিশাল (ইংলিশ ভার্সন)	প্লে থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি	প্লে থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি

নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী শাখার বৈশিষ্ট্য

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ফ্রি শিক্ষা কার্যক্রমের পদক্ষেপ হিসাবে ছানাবিয়্যা ও কুল্লিয়্যা (দাওরা) স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর ফ্রি থাকা-খাওয়া এবং মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে ইনশা-আল্লাহ।

- যোগ্য দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- আরবী ও ইংরেজি ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি মুহাদ্দিছীনের মাসলাক অনুসরণ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা শিক্ষা দান।
- দেশী-বিদেশি উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাসের সমন্বয়ে প্রণীত সিলেবাসের আলোকে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যকর মনোরম পরিবেশ, উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা এবং শরীরচর্চার জন্য উন্মুক্ত খেলার মাঠ।
- আরবী ও ইংরেজিতে বক্তৃতার দক্ষতা অর্জনে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য সর্বদা অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক তদারকির ব্যবস্থা।
- সকল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা।

বরিশাল (ইংলিশ ভার্সন) শাখার বৈশিষ্ট্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ এর প্রথম ইংলিশ ভার্সন শাখা 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (ইংলিশ ভার্সন)' বরিশাল।

- সম্পূর্ণ অবচেতন পদ্ধতি ও চমৎকার সমন্বিত পন্থায় আরবি ও ইংরেজি ভাষা শেখানো।
- আরবী ও ইংরেজি ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, নির্ভয়ে বক্তব্য প্রদান ও সাবলীল ভঙ্গিতে কথোপকথনে দক্ষতা অর্জন।
- অভিজ্ঞ হাফেয ও ক্বারীর মাধ্যমে তিন বছরে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করা।
- বাংলা, গণিত ও বিজ্ঞানে সমকালীন চাহিদার মোকাবেলায় যোগ্যতা অর্জন।
- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকদের সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ।
- প্রতিদিন রুচিসম্মত নাস্তা ও তিনবেলা স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন।
- জামা-কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করার জন্য লন্ড্রী সার্ভিস।
- ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়মিত ক্লাস পর্যবেক্ষণ।

যোগাযোগের ঠিকানা

নারায়ণগঞ্জ শাখা
বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৯৪৭-৯০৫৫৭০, ০১৭২৬-৫৯৭৬৪৬
jamiahsalafiayahrar@gmail.com

রাজশাহী শাখা
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমখদুম, রাজশাহী।
০১৪০৭-০২১৮২২, ০১৪০৭-০২১৮০৭
jamiahraj.edu@gmail.com

বরিশাল শাখা
গোরাচাঁদ দাস রোড (ওয়ার্ড-২৬)
০১৭২৩-০০৮৪৯১
salafienglishversionschool@gmail.com

ভর্তি ফরম পূরণ করতে ভিজিট করুন : **jamiah.nirf.org.bd**